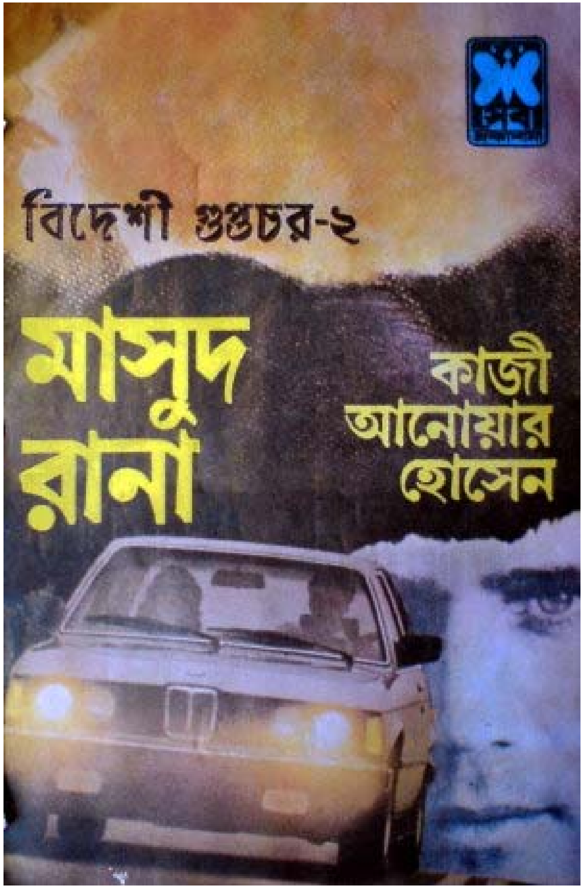

মাসুদ রানা

বিদেশী গুপ্তচর-২

কাজী আনোয়ার হোসেন

প্রথম প্রকাশঃ জুন, ১৯৭৪

এক

মার্সোরিয়ার ক্লক টাওয়ারে ব্রোঞ্জের দুটো দৈত্যের মূর্তি ঢং ঢং পিটিয়ে চলেছে প্রকাণ্ড ঘণ্টা। রাত বারোটা।

সান জাকারিয়া ভেপোরেটি স্টেশনে ল্যাণ্ডিং স্টেজে গনডোলাটা বেঁধে রেখে দ্রুতপায়ে হাঁটছে ওরা ওস্তাদের কোয়ার্টারের দিকে। বার বার পিছু ফিরে, অন্ধকার গলিতে মোড় ঘুরেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে নিশ্চিন্ত হয়েছে ওরা, কেউ অনুসরণ করছে না ওদের।

পথ চলতে চলতে দাড়ি গোঁফ খসিয়ে ফেলল রানা, এখন আর দরকার নেই ওসবের। চিনে ফেলেছে ওরা ওকে। এবার যা হবে সামনা-সামনিই হোক, পুলিসের হাতে ধরা পড়ে ছদ্মবেশের কৈফিয়ৎ দিতে চায় না ও আর। কেন যেন রানার মনে হচ্ছে, ওরা এবার পুলিসের সাহায্য নেবে। মহা বিপদে ফেলে দিতে পারে ওরা যদি পুলিসের সাথে লাইন থাকে।

দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ। টোকা দিতেই ভারি কর্কশ কণ্ঠে প্রশ্ন এল, 'কে? কি চাই?'

'আমরা, ওস্তাদ,' বাতিস্তা বলল। 'দরজা খুলুন।'

'উঁহুঁ। এই জানালার পাশে এসে দাঁড়াও। চেহারা না দেখে

খুলছি না।’

প্রমাদ গুণল রানা। আসল চেহারায় চিনবে না ওকে ওস্তাদ। তবু গিয়ে দাঁড়াল জানালার পাশে।

‘একটাকে চিনলাম, কিন্তু এটাকে আবার কোত্থেকে জোটালে? দেখলে মনে হয় খুনী! আমার আসল সাগরেদ কোথায়?’

‘আসল সাগরেদ আবার কে?’ অবাক হলো বাতিস্তা।

‘আরে ক্যাপ্টেন। সেই দারুণ ছেলেটা। কি নাম যেন...’

‘ইনিই সিনর মাসুদ রানা, ওস্তাদ। দরজা খুলুন। ছদ্মবেশ খুলে ফেলেছেন।’

বিস্ফারিত চোখে রানাকে দেখল পাগলা ওস্তাদ।

‘আরে! এ দেখছি মুহূর্তে মুহূর্তে ভোল পাল্টাচ্ছে। তাজ্জব কারবার! কোন্ ইয়ারে পাস করেছ?’

দরজা খুলে দিতেই ঘরে ঢুকে পড়ল ওরা, ছিটকিনি তুলে দেয়া হলো আবার।

‘কেমন আছে অনিল?’ জিজ্ঞেস করল রানা।

‘যেমন ছিল তেমনি। তবে শিগগিরই ভাল হয়ে উঠবে। আউন্স দুয়েক ব্র্যাণ্ডি খাইয়ে দিয়েছি। আমার মনে হয় যত্নের অভাবে এই হাল হয়েছে ছেলেটার, খানিক আদর-যত্ন পেলেই ঠিক হয়ে যাবে। ডাক্তার দেখানো দরকার।’ হঠাৎ খেয়াল করল ওস্তাদ ওদের ভেজা জামা কাপড়। ‘আরে! দু’জনেই দেখছি চুপচুপে হয়ে ভিজে এসেছ। ছেড়ে ফেলো, কাপড় ছেড়ে ফেলো। পাশের ঘরে উনুনে দিলে শুকিয়ে যাবে দশ মিনিটে।’

আলমারি থেকে দুটো বেড কাভার বের করে ছুঁড়ে দিল ওস্তাদ ওদের দিকে। খপ করে একটা শূন্যে ধরে খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। মড়ার মত পড়ে আছে অনিল। গলা পর্যন্ত কম্বল দিয়ে ঢাকা। পাল্স্ পরীক্ষা করল রানা। আগের চেয়ে কিছুটা ভাল, কিন্তু খুবই দুর্বল। ভরসা পেল না রানা। একে নিয়ে কি

করে কলকাতায় ফিরবে সে?

কাপড় ছাড়তে শুরু করল রানা। পাশের ঘর থেকে তিনজনের জন্যে তিন কাপ গরম কফি নিয়ে এল ওস্তাদ। বাষ্প উঠছে। ওদিকে একবার চেয়েই জিভে পানি এসে গেল রানার। আর ওস্তাদের জিভে পানি এসে গেল রানার পেটা শরীরের দিকে একবার নজর বুলিয়ে।

‘বাহ, বড় সুন্দর ফিগার তো হে তোমার! কোন্ ইয়ারে পাস করেছ?’ ট্রেটা নামিয়ে রেখে এগিয়ে এল ওস্তাদ, রানার বাইসেপ, চেস্ট, থাই আর কাফ মাস্‌ল্ টিপে দেখল, কয়েক পা দূরে সরে গিয়ে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখল আপাদমস্তক, তারপর বলল, ‘এত ব্যাল্যান্সড্ ফিগার সহজে চোখে পড়ে না। তিন বছর আগে এসেছিল একটা ছাত্র, মাত্র গড়ে তুলতে শুরু করেছিলাম, এমন সময় বদলি হয়ে চলে গেল ওর বাপ মিলানোতে। এমন রাগ লেগেছিল আমার। এত করে বললাম...যাকগে, কেউ কোথাও চোট পেয়েছ? মালিশ বা ম্যাসেজ লাগবে?’

‘আমার লাগবে ওস্তাদ,’ বলল বাতিস্তা। ‘পিঠে।’

‘কফিটা খেয়ে নাও, দিচ্ছি ঠিক করে।’

তাকের উপর থেকে একটা মলমের কৌটা পেড়ে এনে রাখল ওস্তাদ টেবিলে। রানার দিকে ফিরল।

‘এবার কি করবে, ক্যাপ্টেন? একে নিয়ে কি করা যায়?’ অনিলের দিকে ইঙ্গিত করল ওস্তাদ।

‘একে নিয়ে কলকাতায় ফিরে যেতে চাই। আগামীকাল সন্ধের আগে অ্যালিটালিয়ার কোন ফ্লাইট নেই, ভাবছি সম্ভব হলে একটা প্লেন চার্টার করব।’ কফির কাপে চুমুক দিল রানা।

‘যাই করো, একে নিয়ে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পৌঁছতে হবে তোমাকে। সেটা সহজ হবে না। যতদূর বোঝা গেল, যেমন ভাবে পারে বাধা দেবে শয়তানগুলো। ওদের লোকজনও দেখলাম

প্রচুর। আমার সব সাগরেদকে ডেকে পাঠাব কিনা ভাবছি। তিন হাজার সাগরেদ এসে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে আমি একটা ডাক দিলে।'

'তার দরকার নেই, ওস্তাদ।' হাসল রানা। 'আপনার পুরানো সাগরেদদের মধ্যে খুব বড়লোক কেউ আছে?'

'অনেক আছে। কেন?'

ভেজা কাপড়গুলো শুকোতে দিয়ে ফিরে এসে বসল বাতিস্তা রানার পাশে। একটা কফির কাপ তুলে নিল।

'তাদের মধ্যে কারও মোটরবোট আছে?'

ছাতের দিকে চেয়ে এক সেকেণ্ড চিন্তা করল পাগলা ওস্তাদ। তারপর বলল, 'আছে। কেন?'

'আপনি চাইলে দু'দিনের জন্যে পাওয়া যাবে বোটটা?'

'আমি চাইলে ধন্য হয়ে যাবে ম্যারিয়ানো। তোমার লাগবে? বোটে করে লিডো যেতে চাইছ? চিন্তা নেই, যখন বলবে তখুনই জোগাড় করে দিতে পারব মোটরবোট। কখন লাগবে তোমার?'

'আগে এর অবস্থাটা ভাল করে বুঝে নেয়া দরকার,' বলল রানা অনিলকে দেখিয়ে। 'বিশ্বাস করা যায় এমন কোন ডাক্তার আছে আপনার চেনাজানা?'

মাথা ঝাঁকাল ওস্তাদ। 'আছে। ডক্টর ভিসকন্টিকে ডেকে আনা যায়। ইউনিভার্সিটির ডাক্তার। একটু বেশি বুড়ো, কিন্তু লোক ভাল। কাছেই থাকে, বেশি দূরে না, ডেকে আনা দরকার?'

'ডাকলে ভাল হয়।'

'ঠিক আছে, বাতিস্তার পিঠটা ঠিক করে দিয়েই ডেকে আনছি।' মৃদু চাপড় দিল বাতিস্তার পিঠে। 'শুয়ে পড়ো হে, ছোকরা। কি শরীর বানিয়েছ যে ব্যথা লাগে? শুয়ে পড়ো।'

মেঝের উপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল বাতিস্তা। কৌটো থেকে মলম বের করে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ওস্তাদ ওর পিঠের

উপর। হুম-হাম শব্দ হলো কিছুক্ষণ, তারপর হাফপ্যান্টের পিছনে দুই হাত মুছে নিয়ে উঠে দাঁড়াল ওস্তাদ। উঠে বসে হাত-পা ঝাড়া দিল বাতিস্তা, পিঠ বাঁকিয়ে পরীক্ষা করল ব্যথাটা আছে কিনা, তারপর হাসল।

'ওস্তাদের হাতে জাদু আছে। গুণ না থাকলে কি আর এতগুলো ছেলে ওস্তাদ বলতেই একেবারে অজ্ঞান হয়ে যায়? ব্যথাটা একেবারে গায়েব।'

'হয়েছে, হয়েছে। আর তেল মারতে হবে না। দরজা লাগিয়ে চুপচাপ বসে থাকো। সাবধানে থাকবে। আর, কেউ দরজায় টোকা দিলেই হুট করে খুলবে না। বুঝেছ?'

বেরিয়ে গেল পাগলা ওস্তাদ। দরজা লাগিয়ে দিয়ে আবার একবার অনিলের পাল্‌স্ দেখল রানা। দুশ্চিন্তা ফুটে উঠল ওর চোখেমুখে। ওয়াটারপ্রুফ সিগারেট কেস থেকে সিগারেট বের করে ধরাল, বসল খাটের কিনারে। বাতিস্তা বসল একটা চেয়ারে।

'সিনর চ্যাটার্জীর ওপর নির্যাতন করা হচ্ছিল ওই বাড়িতে,' যেন কথার কথা বলছে এমনিভাবে বলল বাতিস্তা। 'তার মানে, যা জানতে চায়, জুলির ওপর নির্যাতন করে সেটা জানতে পারেনি ওরা। কিন্তু কি জানতে চায়? কি এমন তথ্য আছে এর কাছে যেটা ওদের না পেলেই নয়? এতখানি মরিয়া হয়ে উঠেছে কেন ওরা?'

'এর উত্তর আমার জানা নেই, বাতিস্তা। তবে মনে হচ্ছে শিগগিরই জানতে পারব।'

কথাটা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই চোখ মেলল অনিল। সোজা চেয়ে আছে রানার মুখের দিকে। স্থির দৃষ্টি। কেমন যেন শিরশির করে উঠল রানার শিরদাঁড়ায়। ভাবলেশহীন, প্রাণহীন, চকচকে, স্থির দৃষ্টি। মনে হচ্ছে মরা মানুষের চোখ। ঠোঁট দুটো একটু কাঁপল অনিলের, মাথাটা একপাশে ফিরল কিছুটা।

'অনিল! আমি রানা। মাসুদ রানা। শুনতে পাচ্ছ? আমি মাসুদ

রানা।’

খুব ধীরে ধীরে রানার দিকে ফিরল অনিল। প্রাণহীন দৃষ্টিটা পার হয়ে গেল রানার মুখ, দেখতে পেল না রানাকে।

‘অনিল! তুমি এখন নিরাপদ। আর কোন ভয় নেই।’ গলার স্বর আর একটু চড়িয়ে দিল রানা। ‘কোন ভয় নেই। আমি রানা। চিনতে পারছ?’

অনিলের সারা শরীর শিউরে উঠল একবার। হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠল ওর চোখ দুটো। রানার মুখের উপর নিবদ্ধ হলো ওর দৃষ্টি।

‘কোন চিন্তা নেই, অনিল। কোন ভয় নেই। কথা বোলো না এখন, নিশ্চিন্তে ঘুমাও। ডাক্তার আসছে, সব ঠিক হয়ে যাবে।’

ব্র্যাণ্ডি মিশানো দুধের বাটিটা নিয়ে এল বাতিস্তা। মাথাটা একটু উঁচু করে ধরল রানা, কয়েক চামচ দুধ খাওয়াল ওকে বাতিস্তা। চোখ বন্ধ করতেই বোঝা গেল আর খাবে না। মাথাটা বালিশের উপর নামিয়ে দিল রানা।

রক্তশূন্য মুখটা কুঁচকে কুঁচকে উঠছে থেকে থেকে।

উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে রানা ও বাতিস্তা ওর মুখের দিকে। মিনিট পাঁচেক পর আবার চোখ মেলল অনিল, রানাকে খুঁজে পেয়ে স্থির হলো ওর দৃষ্টিটা রানার মুখে। নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না যেন অনিল। ওর বুকের ওপর হাত রাখল রানা আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে।

‘আমার সামনে জুলিকে ওরা…জুলিকে…’ গলাটা ভেঙে গেল অনিলের। যেন নালিশ জানাচ্ছে রানার কাছে। চোখ ফেটে পানি বেরিয়ে এল। টপ টপ ঝরছে বালিশের উপর।

‘এখন কথা বোলো না, অনিল। যা হবার হয়ে গেছে, ওসব নিয়ে ভেবো না এখন। চুপচাপ বিশ্রাম নাও।’

আবার ঠোঁট নড়ল অনিলের। কি বলছে বোঝা গেল না। ওর

মুখের কাছে কান নিয়ে গেল রানা। শুনতে পেল, ফিস ফিস করে অনিল বলছে, ‘মরে যাচ্ছি, কিন্তু…তার আগে…আগে…’

‘মরার কথা ভুলে যাও অনিল। ওই বাড়ি থেকে বের করে এনেছি তোমাকে আমরা। আর কোন ভয় নেই। মরবে না তুমি। তোমার মায়ের লেখা একটা চিঠি আছে আমার কাছে, একটু ভাল হয়ে উঠলেই দেব তোমাকে। এ যাত্রায় আর মরণ নেই তোমার। আমি ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি তোমাকে কলকাতায়।’

‘পারবে না।’ দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল অনিল। ‘ওরা…ওরা ভয়ানক…শোনো, রানা…’ ক্রমে দুর্বলতর হচ্ছে অনিলের কণ্ঠস্বর। সামনে ঝুঁকে প্রায় ওর ঠোঁটের কাছে কান ঠেকাল রানা। কি বলল বোঝা গেল না, শুধু দুটো শব্দ শুনতে পেল সে, ‘ডি ফ্যাবোরি…মন্দির…’

‘কি বললে? অনিল, কি বললে?’

আরও কি যেন বলবার চেষ্টা করল অনিল, কিন্তু ঠোঁট দুটো নড়ল কেবল, কোন রকম শব্দ বেরোল না গলা দিয়ে। এইটুকু পরিশ্রমেই বুজে এল চোখ, ক্লান্তি ও দুর্বলতায় জ্ঞান হারাল আবার।

সোজা হয়ে বসল রানা।

‘কি যেন বলবার চেষ্টা করছিল অনিল,’ প্রায় আপন মনে বলল রানা। ‘কি বলতে চাইছিল ও? দুটো মাত্র কথা। ডি ফ্যাবোরি, আর মন্দির। কি বোঝায় এতে? ডি ফ্যাবোরি বলে একটা জায়গা আছে জানি…’

‘ভার্জিন মাদারের একটা মন্দিরও আছে ওখানে,’ বলল বাতিস্তা।

‘ঠিক বলেছ!’ উৎসাহিত হয়ে উঠল রানা। ‘কিন্তু…তাতে কি বোঝায়? কি বলতে চাইছিল ও?’

ঠক ঠক ঠক! টোকা পড়ল দরজায়।

‘কে?’ উঠে গিয়ে জিজ্ঞেস করল বাতিস্তা। ‘জানালার কাছে এসে দাঁড়ান।’

ভাল মত পরীক্ষা করে দেখে নিয়ে দরজা খুলে দিল বাতিস্তা। ওস্তাদের পিছন পিছন ঘরে ঢুকল শুকনো, খিটখিটে চেহারার প্রবীণ এক লোক। তোবড়ানো গালে বয়সের ভাঁজ।

‘ইনি ডক্টর ভিসকন্টি,’ বলল ওস্তাদ।

উঠে দাঁড়াল রানা। ‘আমি মাসুদ রানা।’ হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করল। ‘আমার এক বন্ধু গুরুতর অসুস্থ। একটা দলের সাথে গোলমাল বেধেছিল ওর। বিস্তারিত সবকিছু জানি না আমি, গোলমালটা রাজনৈতিকও হতে পারে। ওকে গুলি করে জখম করা হয়েছে। তার ওপর নির্যাতন করা হয়েছে। ব্যাপারটা গোপনীয়। কাজেই আপনার এই ব্যাপারে মুখ বন্ধ রাখতে হবে।’

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রানার দিকে চাইল ভিসকন্টি। ঘন ভুরু জোড়া কুঁচকানো।

‘আমার পক্ষে সেটা সম্ভব নয়, সিনর। আপনার বন্ধু যদি জখম হয়ে থাকে, আমার কর্তব্য হচ্ছে পুলিসে জানানো। পুলিসে খবর দিতেই হবে আমাকে।’

‘কিন্তু আমার বন্ধু ভারতীয়। ইটালিয়ান পুলিসের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। ইণ্ডিয়ান হাই কমিশনে জানানো হবে ব্যাপারটা।’

কাঁধ ঝাঁকাল ডক্টর ভিসকন্টি।

‘তবু পুলিসে জানানোই আমাদের নিয়ম। তবে আপনার বন্ধু যদি ভারতীয় হন, সেক্ষেত্রে আমি চেপে যেতে পারি বিদেশী বলে। যাই হোক, রুগীকে দেখা যাক আগে।’

এক মিনিট পরীক্ষা করেই উঠে দাঁড়াল ডাক্তার। গম্ভীর মুখে কাঁধ পর্যন্ত ঢেকে দিল অনিলকে কম্বল দিয়ে।

‘এর অবস্থা খুবই খারাপ। এক্ষুণি হাসপাতালে ভর্তি করা

দরকার। অ্যাকিউট নিউমোনিয়া হয়ে গেছে, তাছাড়া এক্সপোজার ও শক লেগেছে ভয়ানক। গোপনীয়তার কোন উপায় নেই।’

‘এখানে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় না?’ বলল রানা। ‘খরচের জন্যে ভাববেন না। হাসপাতালে না নিয়ে যদি ওকে সুস্থ…’

মাথা নাড়ল ডাক্তার।

‘মারা যাবে তাহলে। এক্ষুণি হাসপাতালে নেয়া দরকার। ওখানে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি আছে। আধ ঘণ্টার মধ্যে অক্সিজেন টেন্টে না রাখলে বাঁচানো যাবে না একে।’

বাতিস্তার দিকে ফিরল রানা।

‘ঠিক আছে। তুমিও যাবে অনিলের সাথে হাসপাতালে। এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করবে না ওকে। আমি ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে আসছি হাসপাতালে। কয়েকটা কাজ সেরেই আমি চলে আসব, তখন তোমার ছুটি।’

‘অলরাইট, সিনর।’

একটু উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে চাইল ডাক্তার রানার দিকে। ‘আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে ভদ্রলোক এখনও বিপদমুক্ত নন। ব্যাপারটা পুলিসে জানালেই কি ভাল হত না?’

‘তার আগে আমি ভারতীয় হাই কমিশনারের সঙ্গে কথা বলতে চাই। একে হাসপাতালে নেয়ার কি ব্যবস্থা?’

‘আপনারা যদি ওকে বয়ে নিয়ে গনডোলায় তুলতে পারতেন তাহলে সবচেয়ে ভাল হত। আমি স্ট্রেচারের ব্যবস্থা করতে পারি, কিন্তু এখন সময়ের অনেক দাম। যত তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নেয়া যায়…’

‘আমি কোলে করে নিয়ে যাব ওকে। গনডোলাও রেডি, কোন অসুবিধে হবে না।’

‘বেশ। তাহলে রওয়ানা হওয়া যাক। আমি একটু তাড়াতাড়ি

বেরিয়ে পড়ি, এর জন্যে কেবিনের ব্যবস্থা করে ফেলি গিয়ে। আপনারা আসুন।' ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করল ডাক্তার।

ডাক্তারের বাহুতে একটা হাত রাখল রানা। 'বুলেটটা ভিতরে রয়ে গেছে, না বের করে ফেলা হয়েছে?'

'সেটা হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে বলা যাবে।'

'জখমে কি গ্যাংগ্রিনের আভাস পেলেন?'

'সেই জন্যেই তো এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি।'

'বাঁচবে বলে মনে হয়?'

'চেষ্টার তো ত্রুটি করব না। কিন্তু এখন অনেকখানি নির্ভর করে রুগীর স্ট্যামিনার ওপর। বাঁচবেই, একথা জোর দিয়ে বলা যায় না, তবে চান্স আছে।'

'আপনার সাথে আমাদের কারও যাওয়ার প্রয়োজন আছে?'

'না। তার দরকার নেই। আমি সব ব্যবস্থা করে রাখি গিয়ে, আপনারা আসুন।'

দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল ডাক্তার ভিসকন্টি। দরজা বন্ধ করে ফিরে এসে ওস্তাদের কাঁধে হাত রাখল রানা।

অনিলকে কোলে তুলে নেয়ার ব্যবস্থা করছিল ওস্তাদ, চমকে চাইল রানার দিকে।

ইশারায় পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে গেল রানা ওস্তাদ এবং বাতিস্তাকে। ফিস ফিস করে বলল, 'ভুলটা আমারই হয়েছে। ডাক্তার ডাকা উচিত হয়নি।'

'কেন?' চোখ কপালে উঠল ওস্তাদের।

'আপনি নিজে কয়েকটা ব্যাপার পরীক্ষা করে দেখে আসুন পাশের ঘর থেকে, তারপর ব্যাখ্যা দেব।'

এদিকের ঘরে এসে অনিলের পালস্ পরীক্ষা করল ওস্তাদ, কাঁধের জখমটা শুঁকে দেখল ব্যাণ্ডেজের কাছে নাক ঠেকিয়ে, বুকে

কান ঠেকিয়ে শুনল শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ, ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল তার মুখের চেহারা। ফিরে এসে কটমট করে চাইল রানার দিকে।

'ব্যাটা থাকতে থাকতেই কথাটা বলনি কেন? এক কিলে হারামজাদার মাথাটা ভেঙে দিতাম আমি।'

দ্রুতহাতে কাপড় পরছে রানা ও বাতিস্তা।

'শেষ মুহূর্তে সন্দেহটা হলো আমার,' বলল রানা। 'আমরা পুলিসে জানাব না শুনে স্বস্তির ভাব ফুটে উঠল ওর মুখে। তাই দেখেই শেষের কয়েকটা প্রশ্ন করলাম। নিজেই তো দেখলেন, গ্যাংগ্রিন-নিউমোনিয়া, সব বাজে কথা। সিলভিওর আদেশে আগাগোড়া মিথ্যে কথা বলছে ডাক্তার।'

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল ওস্তাদ। কঠোর হয়ে উঠেছে মুখের চেহারা। কথা বলেই চলল রানা।

'আমার যতদূর বিশ্বাস হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছতে পারব না আমরা। তার আগেই আসবে আক্রমণ। খুব সম্ভব গনডোলার ওপর আক্রমণ করবে ওরা। তবু যেতে হবে আপনাদের।'

'আর অনিল?'

'বাঁচতে হলে আগে মরতে হবে ওকে। আশে পাশে কোথাও ওকে দু'চারদিন রাখার মত কোন জায়গা আছে?'

'আছে।'

'তাহলে শুনুন মন দিয়ে। তুমিও শোনো, বাতিস্তা...'

সংক্ষেপে প্ল্যানটা বুঝিয়ে দিল রানা ওদের। একটানা তিন মিনিট কথা বলে থামল।

'আর ওর চিকিৎসার কি হবে?' প্রশ্ন করল ওস্তাদ।

'আগামীকাল দুপুরের মধ্যে লাইন ক্লিয়ার করে দেব আমি। চিকিৎসার কোন অসুবিধে থাকবে না আর। অবশ্য আমার ধারণা, দু'দিন বিশ্রাম পেলে অনেক ভাল হয়ে যাবে ও এমনিতেই। ডক্টর ভিসকন্টির ওপর রাগ করে লাভ নেই, ওস্তাদ, ওদের সাহায্য না

করে উপায় নেই ওর, প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে যেত তাহলে। সব ডাক্তারের একই অবস্থা। কিন্তু কাল দুপুরের পর রিপোর্ট করার লোক পাবে না ওরা ভেনিসে।'

'বেশ। তোমার সাথে কোথায় দেখা হচ্ছে আমাদের?' জিজ্ঞেস করল ওস্তাদ।

'আমার সাথে দেখা করবেন ডেলা টলেটা প্যালাযোতে। লাইবেরিয়া ভেচিয়ার কাছে। একশো বাহাত্তর নম্বর। ওখানেই পরবর্তী প্রোগ্রাম ঠিক করা যাবে।'

'আর আক্রমণ না এলে?' হাসল বাতিস্তা। 'তাহলে কি বোঁচকা নিয়ে খামোকা হাসপাতালে গিয়ে হাজির হব?'

'আক্রমণ আসবেই। কিন্তু সাবধান! দেখো, ধরা পড়ো না আবার। তাহলে সব কিছু গোলমাল হয়ে যাবে।'

আর কথা না বাড়িয়ে নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় আলাপ করে বেরিয়ে পড়ল ওস্তাদ অনিল আর বাতিস্তাকে নিয়ে বাড়ির পেছন দরজা দিয়ে। আগাগোড়া প্ল্যানটা মনের মধ্যে নেড়েচেড়ে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে লাইট নিভিয়ে বেরিয়ে গেল রানা সামনের দরজা দিয়ে। চারপাশে একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে দ্রুত পায়ে এগোল ডি ফ্যাবোরির দিকে।

এত রাতেও ডি ফ্যাবোরি জনাকীর্ণ। মনটা দমে গেল রানার। একদল আমেরিকান ট্যুরিস্ট হাঁটছে ঢিমে তেতালা ছন্দে, হাউ বিউটিফুল, হাউ নাইস, হাউ ডিলাইটফুল বলতে বলতে। তাদের বেশ কিছুটা পিছনে হাঁটছে তিনজন বয়স্কা মহিলা একজন বয়স্ক গাইডের অনর্গল বক্তৃতা শুনতে শুনতে। তারও গজ দশেক পিছনে হাঁটছে একজোড়া নব দম্পতি- খুব সম্ভব হানিমুনে এসেছে। এত লোকের মধ্যে ভাল করে পরীক্ষা করা যাবে না দেয়াল-মন্দিরটা।

একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল রানা। লোকজন একটু হালকা হোক।

মন্দিরের কথাটা বলল কেন অনিল? ও কি ওখানে কোন মেসেজ লুকিয়ে রেখেছে? কিংবা কোন জিনিস? মন্দিরের সাথে ওর এই নিখোঁজ হওয়ার কি সম্পর্ক? মন্দিরের কথাটা সজ্ঞানে বলেছিল অনিল, নাকি প্রলাপ বকছিল তখন? কি আছে ওখানে?

পিছন ফিরে চাইল রানা। নতুন কোন ট্যুরিস্ট নেই। সান মার্কোর পিছন দিকটা দেখা যাচ্ছে। মন্দিরটা রিয়াল্টো ব্রিজের কাছাকাছি, জানে রানা। সামনের লোকজন বেশ কিছুটা এগিয়ে যেতেই ধীর পায়ে চলতে শুরু করল। বেশ কিছুদূর এগিয়ে আবার থামল একটা অন্ধকার ছায়ায়। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে মন্দিরটা। একটা ম্লান আলো জ্বলছে দেয়ালের গায়ে। আমেরিকানদের দলটা থেমে দাঁড়িয়ে মিনিট তিনেক হাউ নাইস, হাউ এনচ্যানটিং-এর পর আবার হাঁটতে থাকল সামনের দিকে। প্রবীণ দলটাও বেশি দেরি করল না। কিন্তু নব-দম্পতি প্রেমে পড়ে গেল মন্দিরটার। মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে ওরা, নড়বার কোন লক্ষণই নেই।

'কি অপূর্ব! তাই না?'

'সত্যি!' মেয়েটার কোমর জড়িয়ে ধরল ছেলেটা। 'ঠিক তোমার মত।'

ছেলেটার চোখে চোখ রাখল মেয়েটা। বিভোর হয়ে গেল দু'জন দু'জনাতে।

'দশ বছর পর একথা বলবে?' আহ্লাদী ভঙ্গিতে ঘাড় কাৎ করল মেয়েটা।

ঝেড়ে গাল দিল রানা ওদের মনে মনে। কিন্তু তাতে এতটুকু বিচলিত হলো না ওদের মুগ্ধ বিস্ময়। আসলে দর্শনীয় বস্তু দেখতে আসেনি ওরা, আবিষ্কার করছে একে অপরকে নিবিড় ভাবে, টুকরো কথায়।

'বলব, চেরি। কিন্তু তোমার কি ভাল লাগবে তখন এসব

শুনতে? কাচ্চা-বাচ্চা, ক্যাঁও-ম্যাঁও নিয়ে পাগল হয়ে থাকবে তুমি, আমাকে দেখলেই হয়তো খ্যাঁক করে উঠতে ইচ্ছে করবে তখন তোমার।'

'যাহ্, কক্ষনো না। আমি ওরকম হব না কোনদিনই।'

হাসল ওরা পরস্পরের দিকে চেয়ে, গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে চুমো খেল।

ওদের ছেড়ে ওদের বাপ-মাকে ধরল রানা এবার। অসহিষ্ণু ভাবে একবার এ পা, একবার ও পায়ের উপর ভর দিয়ে অপেক্ষা করছে সে। বিড় বিড় করে অনর্গল খিস্তি বেরোচ্ছে ওর মুখ থেকে। খুব সম্ভব টনক নড়ল এতে ছোকরার স্বর্গীয় পিতার, কিংবা রানার কাশির শব্দ শুনতে পেল সে, শুভ বুদ্ধির উদয় হলো ওর মধ্যে। ততক্ষণে সশব্দে পা ফেলে এগোতে শুরু করেছে রানা। পিছন ফিরে রানার দিকে একবার চেয়ে মৃদু টান দিল মেয়েটার কোমরে।

'চলো এগোই, চেরি। খিদেয় নাড়িভুঁড়ি জ্বলছে। সামনের কোন রেস্তোরাঁয় খেয়ে নেয়া যাক।'

হাঁপ ছেড়ে বাঁচল রানা। চলে যাচ্ছে নব দম্পতি। দ্রুত পা ফেলে চলে এল সে মন্দিরটার কাছে।

কিছুই মাথায় ঢুকল না রানার। দেয়ালের গায়ে ছোট একটা গর্ত। মোটা শিকের গরাদ দিয়ে ভিতরটা সুরক্ষিত। ভিতরে ভার্জিন মেরির ছোট্ট একটা মূর্তি। মূর্তির সামনে ফুলদানীতে প্লাস্টিকের আর্টিফিশিয়াল ফুল সাজানো। পাশেই জ্বলছে একটা প্রদীপ।

ছোট্ট মন্দিরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করল রানা। কিন্তু অনিলের সাথে মন্দিরের কিভাবে কি সম্পর্কে থাকতে পারে মাথায় এল না ওর। হতাশ হলো যারপর নাই।

ফিরে যাচ্ছিল রানা, দু'পা এগিয়ে থেমে দাঁড়াল ভুরু কুঁচকে।

কিছু নিশ্চয়ই আছে। এমন ভাবে কথাটা বলেছিল অনিল যেন মৃত্যুর আগে শেষ মেসেজ দিয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই কিছু একটা নজর এড়িয়ে যাচ্ছে ওর। অনিলের মন্দিরের কথা উচ্চারণ অর্থহীন হতেই পারে না। আবার দেয়ালের ফোকরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইল সে প্রত্যেকটা জিনিসের দিকে। তারপর গরাদের ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিল ডান হাতটা। কনুই পর্যন্ত ঢুকে আটকে গেল হাত। বহুকষ্টে ঠেলেঠুলে আরও কিছুদূর ঢুকাল সে হাত, তারপর ফুলদানীটা কাত করল এদিকে।

ফুল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না রানা সেখানে। তবু কাছে টেনে আনল সে ফুলদানীটা। যদি কিছু লুকিয়ে রাখা হয়ে থাকে এখানে, তাহলে সেটা এই ফুলদানীর মধ্যেই থাকবে।

ফুলগুলো বের করে পাথরের মেঝেতে নামিয়ে রাখল রানা। তারপর হাত ঢোকাল ফুলদানীর সরু গর্তের ভিতর। কি যেন ঠেকল হাতে। কিছু একটা জিনিস গুঁজে রাখা আছে নিচের দিকের সরু ফোকরে। দুই আঙুলে ধরে সাবধানে বের করে আনল রানা জিনিসটা। ছোট্ট একটা প্যাকেট। নীল প্লাস্টিক দিয়ে মোড়া।

ফুলগুলো আবার যথাস্থানে রাখতে গিয়েও নিজের অজান্তেই পিছন ফিরে চাইল রানা।

দ্রুতপায়ে আসছে দু'জন লোক। একজনের পরনে সাদা স্যুট, সাদা হ্যাট। ওড্ডি!

সরু গরাদের ফাঁক দিয়ে হাতটা টেনে বের করতে গিয়ে ছড়ে গেল খানিকটা, কিন্তু ব্যস্ততার জন্যে টেরও পেল না রানা। সরে এল দেয়ালের ফোকরের কাছ থেকে।

দৌড়াতে শুরু করেছে ওড্ডি। ওর সাথের লোকটাকেও চিনতে পারল রানা। হয় পপিনি, নয় ওর দলের বাকি দু'জনের একজন। গালে একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন। ওড্ডির পিছনে পিছনে দৌড়াতে শুরু করল সেও।

ঝট করে ঘুরেই ছুটতে শুরু করল রানা। পঞ্চাশ গজ দৌড়ে প্রথম ডানদিকের গলিটায় মোড় নিল সে। বিশ গজ পরেই গ্র্যাণ্ড ক্যানাল। ক্যানালের তীর ঘেঁষে চলে গেছে চওড়া একটা রাস্তা। গলি মুখে এসে দৌড়ের গতি কমিয়ে দিল রানা। বড় রাস্তায় পড়েই দেখতে পেল কয়েক গজ দূরে ধীর পায়ে হাঁটছে বেশ বড়সড় একটা ট্যুরিস্টের দল। নিশ্চিন্তে ঢুকে পড়ল সেই দলে।

আলগোছে বুক পকেটে রেখে দিল রানা প্যাকেটটা। তারপর এঁকে বেঁকে ঢুকে গেল দলের ঠিক মাঝখানটায়। এই মুহূর্তে ওকে আক্রমণ করা সম্ভব নয় ওড্ডির পক্ষে, জানে রানা, কিন্তু সহজে পিছন ছাড়বে বলেও মনে হয় না। নিশ্চয়ই ওরাও ঢুকে পড়েছে এই ট্যুরিস্টের ভিড়ে।

ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে চাইল রানা।

ঠিক পাঁচ ফুট পিছনে রয়েছে ওড্ডি। চোখে চোখে চাইল দু'জন। মধুর একটা হাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে। মাথা ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি খবর? কেমন আছেন? ভালো তো?'

ভুরু কুঁচকে কটমট করে চেয়ে রইল ওড্ডি রানার চোখের দিকে। ধ্বক ধ্বক করে জ্বলছে ওর চোখ প্রতিহিংসায়। কোন উত্তর দিল না।

ভিড়ের নিরাপত্তায় গা ভাসিয়ে দিল রানা। ধীর পায়ে হেঁটে চলেছে প্যালাযো ডেলা টলেটার দিকে। নিজেকে ভাগ্যবান মনে করল রানা। একবার বাসায় পৌঁছতে পারলে ওকে বাগে পাওয়া সহজ হবে না এদের পক্ষে। বেশ কিছুদূর হেঁটে আবার পিছু ফিরে চাইল সে।

আছে। ধৈর্যের সাথে ওকে অনুসরণ করে চলেছে। দূরত্ব কমাবার চেষ্টা করছে না।

সান মার্কো পিয়াযার দিকে চলেছে পুরো দলটা। বাসার কাছাকাছি এসেই দ্রুততর করল রানা চলার গতি। সেই সাথে

বাঁয়ে কাটতে শুরু করল। ঠেলে ধাক্কিয়ে বামে কাটছে, আর অনবরত ক্ষমা চাইছে সে। হঠাৎ ভিড় থেকে বেরিয়ে পড়ল রানা, বেরিয়েই পেয়ে গেল ওর বাসায় ঢোকার সিঁড়ি। দ্রুতপায়ে উঠে গেল সে সিঁড়ি বেয়ে উপরে। দরজাটা খুলেই এক পা রাখল হলরুমে।

পিছন ফিরে চাইল রানা।

থামল না ওড্ডি বা তার সাথী। ওর দিকে চাইল না একবারও। এগিয়ে যাচ্ছে ভিড়ের চাপে সামনের দিকে। এত সহজে হাল ছেড়ে দিতে দেখে একটু অবাক হলো রানা, কিন্তু বুঝতে পারল, এত লোকজনের মধ্যে করবার তেমন কিছু নেইও আসলে ওদের।

দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা। প্রকাণ্ড একটা হাঁপ ছেড়ে এগোল ওর শোবার ঘরের দিকে।

দুই সেকেণ্ডের স্বস্তি। তিন পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল রানা। ওর ঘরের দরজার ফাঁক দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। আলো কিসের?

খুব দ্রুত হালকা পা ফেলে একটা টেবিলের ধারে চলে এল রানা। পকেট থেকে নীল প্যাকেটটা বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে। টপ করে প্যাকেটটা ছেড়ে দিল সে একটা সূক্ষ্ম কারুকাজ করা তামার ফুলদানীর মধ্যে। দ্রুতপায়ে ফিরে এল ঘরের মাঝখানে।

ঠিক এমনি সময়ে খুলে গেল ওর শোবার ঘরের দরজা। চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে সিলভিও পিয়েত্রো।

'স্বাগতম, সিনর মাসুদ রানা!' অত্যন্ত ভদ্রভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করল সিলভিও রানাকে। মুখে মিষ্টি হাসি। 'এই অনধিকার প্রবেশের জন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আপনার সাথে জরুরী কথা আছে আমার।'

হাসিমুখে এগোল রানা। 'না, না। এর জন্যে ক্ষমা চাওয়ার

কিচ্ছু নেই। আপনাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্যে আমারই বরং ক্ষমা চাওয়া উচিত। খুব বেশি দেরি করে ফেলিনি তো?'

সোফার উপর বসে আছে লুইসা পিয়েত্রো। দরজার দুপাশে দাঁড়িয়ে গীয়ান আর লাল চুলো সেই লোকটা। দু'জনের হাতে দুটো নাক বোঁচা রিভলভার। রানার দিকে ধরা।

দুই

দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সিলভিও পিয়েত্রো।

'এই নাটকীয়তার জন্যে আমাদের দয়া করে ক্ষমা করে দেবেন, সিনর মাসুদ রানা,' বলল সিলভিও, 'কিন্তু এর প্রয়োজন ছিল। গত কয়েক ঘণ্টায় আপনি প্রমাণ করেছেন যে আপনি একজন অত্যন্ত দুর্ধর্ষ লোক। আপনার সম্পর্কে রিপোর্টও পৌঁছে গেছে আমার হাতে। কাজেই একটু বেশি সাবধানতা অবলম্বন করতে হলো আমাদের। একটা কথা প্রথমেই পরিষ্কার ভাবে আপনাকে জানিয়ে দেয়া দরকার, প্রয়োজন হলে গুলি করবে গীয়ান আর পপিনি। কাজেই কোন রকম গোলমালের চেষ্টা করবেন না অনর্থক। বসুন, কয়েকটা কথা আছে আপনার সাথে।'

সোজা চাইল রানা লুইসার চোখে। কিছু বোঝা গেল না সে-চোখ দেখে। ওর পাশে গিয়ে বসবার জন্যে ইঙ্গিত করল সে রানাকে। এগিয়ে গেল রানা। বসে পড়ল লুইসার পাশে। পিছনে

গীয়ান এসে দাঁড়াল রিভলভারটা রানার পিঠে ঠেকিয়ে।

'এসব ব্যাপারে তুমি কেন আবার?' প্রশ্ন করল রানা।

উত্তর দিল সিলভিও। 'আমি ওকে বারণ করেছিলাম। কিন্তু ওর ধারণা আমি যদি ব্যর্থ হই, ও আপনাকে রাজি করাতে পারবে। ওর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলাম না। লুইসার সামনে আপনাকে এইভাবে রিভলভারের মুখে ছোট করা হচ্ছে বলে আমি খুবই অনুতপ্ত। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। শুধু লুইসার নয়, আপনাকে আমারও ভাল লেগেছে। আপনার কোন ক্ষতি হোক সেটা আমি চাই না।'

'সে তো খুব ভাল কথা!' মৃদু হেসে পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করল রানা। একটা ঠোঁটে লাগিয়ে কেসটা এগিয়ে ধরল সিলভিওর দিকে। 'চলবে? অভ্যাস আছে?'

'না। ধন্যবাদ।' রানার মুখোমুখি একটা সোফায় বসল সিলভিও।

সিগারেট ধরিয়ে লম্বা করে টান দিল রানা, ভুশ করে ধোঁয়া ছাড়ল ছাতের দিকে, পায়ের উপর পা তুলে আরাম করে বসল সোফায় হেলান দিয়ে, তারপর চাইল সিলভিওর চোখে।

'বেশ বলুন এবার, কি ব্যাপারে কথা বলতে চান?'

'অনিল চ্যাটার্জীর ব্যাপারে।' সোফার দুই হাতায় দুই কনুই রেখে বাম হাতের আঙুলের ফাঁকে ডান হাতের আঙুলগুলো ভরে মুঠি পাকাল সিলভিও, সেই মুঠির উপর আলতো করে থুতনি রেখে শুরু করল আবার, 'চ্যাটার্জী একজন ভারতীয়, আপনি বাংলাদেশের লোক। এক ভয়ঙ্কর ব্যাপারে জড়িয়েছে ও নিজেকে। যেমন গোপনীয়, তেমনি বিরাট ব্যাপার। আপনার দেশের সাথে এর সম্পর্ক নেই। কাজেই এক্ষেত্রে বুদ্ধিমানের মত ব্যবহার আশা করব আমি আপনার কাছে। আপনি নিরপেক্ষ থাকুন। ওকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে। এই দণ্ড এড়িয়ে যাবার

উপায় নেই ওর। কারো সাধ্য নেই ওকে রক্ষা করে। আপনি মাঝখান থেকে নাক গলিয়ে নাকটা খোয়াবেন, সেটা আমি চাই না। আমার অনুরোধ, যেহেতু ব্যাপারটা আপনার দেশের সাথে কোন দিক থেকে কোন ভাবে যুক্ত নয়, আপনি এ থেকে দূরে থাকুন।'

'এ তো অতি উত্তম প্রস্তাব। আমি এক কথায় রাজি।'

সতর্ক দৃষ্টিতে চাইল সিলভিও রানার মুখের দিকে। বার কয়েক চোখ মিট মিট করে ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর হাত বাড়াল সামনে। 'তাহলে দিয়ে দিন।'

অবাক হলো রানা। 'কি দিয়ে দেব?'

'একটা নীল প্লাস্টিক মোড়া লাল খাতা। আপনার কাছেই আছে ওটা এখন।'

তিন সেকেণ্ড সিগারেটের মাথার আগুনটা পরীক্ষা করল রানা, তারপর ভুরু জোড়া কপালে তুলল।

'নীল প্লাস্টিক মোড়া লাল খাতা? ওটা আমার কাছে আছে এ ধারণা হলো কি করে আপনার?'

ভুরু কুঁচকে গেল সিলভিওর। তির্যক দৃষ্টিতে চাইল রানার চোখের দিকে। আশ্চর্য ধূর্ত এবং নিষ্ঠুর একটা ভাব খেলে গেল ওর চোখে। এক সেকেণ্ড, তারপর আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল।

'দয়া করে আমাদের সময় নষ্ট করবেন না, সিনর মাসুদ রানা। এই একটু আগে আপনি স্বীকার করেছেন নিরপেক্ষ থাকবেন আপনি। খাতাটা...'

'এক সেকেণ্ড,' বাধা দিল রানা কথার মধ্যে। 'নিরপেক্ষ থাকতে রাজি হয়েছি ঠিকই, কিন্তু আপনাকে সাহায্য করবার কোন আশ্বাস আমি দিইনি। দুটো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। যাই হোক, খাতাটার কথা শোনা যাক। ওটা আপনার?'

'আমার অর্গানাইজেশনের। আমার অফিস থেকে চুরি

করেছিল ওটা অনিল চ্যাটার্জী।'

'কেন চুরি করতে গেল? কি আছে ওর মধ্যে?'

'অত্যন্ত মূল্যবান কিছু গোপনীয় তথ্য আছে। ওটা খোয়া গেলে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘটে যাবে আমাদের ভাগ্যে। পথের ধুলায় মিশে যাব আমরা। আমার ওপর হুকুম হয়েছে, যে ভাবে হোক উদ্ধার করতে হবে ওটা। আমার কাছ থেকে খোয়া গিয়েছিল, আমাকেই উদ্ধার করতে হবে।'

'এত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অনিলের হাতে যখন পড়েছে, আপনাদের সতর্কতার বিশেষ প্রশংসা করা যায় না।'

'তা ঠিক।' মাথা ঝাঁকাল সিলভিও। 'কিন্তু ভয়ানক ধূর্ত এই লোকটা। বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারিনি আগে। তার ওপর দারুণ লোকটার সহ্য ক্ষমতা। এতদিন পর্যন্ত যে টিকে আছে...ভাল কথা, ওকে যে ক্ষিপ্রতা আর বুদ্ধিমত্তার সাথে উদ্ধার করেছিলেন তার জন্যে আপনাকে কংগ্রাচুলেশন জানানো হয়নি এখনও। কংগ্রাচুলেশনস্। দারুণ যোগ্যতার সাথে করেছিলেন কাজটা।'

লজ্জা পাওয়ার ভান করল রানা। 'না, না। কি যে বলেন। আমার যোগ্যতা নয়, ওটা আপনার লোকেদের অযোগ্যতা। যাদের নিয়ে কাজ করছেন...'

'তা ঠিক,' বাঁকা করে হাসল সিলভিও। 'কিন্তু অন্যদিকে তাদের যোগ্যতার অভাব নেই। এরা জানে কি করে মানুষের মুখ থেকে কথা বের করতে হয়।'

'তাই নাকি? কিন্তু মনে হচ্ছে অনিলকে দিয়ে কথা বলাতে পারেনি ওরা, নইলে এখানে আপনার মূল্যবান সময় অপব্যয় করতে হত না।'

'কথা অনিলকে বলতেই হত। আজ হোক কাল হোক স্বীকার না করে উপায় ছিল না। হয়তো সময় লাগত একটু বেশি। অসুস্থ

ছিল বলে সাবধানে এগোতে হয়েছে গীয়ানকে। সুস্থ অবস্থায় থাকলে আরও চাপ দিতে পারত ও, মুমূর্ষু লোককে বেশি চাপ দেয়া যায় না, ফট করে মরে যায়।'

'তাই জ্বলন্ত সিগারেট ঠেসে ধরে মৃদু নির্যাতনের ব্যবস্থা হয়েছিল?'

'ঠিক বলেছেন। আধমরা লোক বা স্ত্রীলোকের ওপর প্রয়োগ করলে এতে বেশ কাজ পাওয়া যায়।'

'জুলি মাযিনিকেও নিশ্চয়ই মরতে হয়েছে গীয়ানের হাতেই?'

'না। ওড্ডি। কথা বের করেছে গীয়ান, কিন্তু শেষ কাজটা সেরেছে ওড্ডি। ডিভিশন অব লেবার। কিন্তু সিনর, আমরা আমাদের বক্তব্য থেকে সরে গেছি অনেক দূরে। দিয়ে দিন প্যাকেটটা।'

মাথার মধ্যে আগুন ধরে গিয়েছিল রানার। এক লাফে খুদে শয়তানটার ঘাড়ে পড়ে কণ্ঠনালীটা টেনে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করল ওর। দাঁতে দাঁত চেপে সামলে নিল সে। সময় আসুক। এখন কিছু করতে গেলে অবধারিত মৃত্যু। সিগারেটে টান দিতে গিয়ে লক্ষ্য করল কাঁপছে ওর হাতটা।

'উত্তেজিত হবেন না, সিনর মাসুদ রানা। আপনি বাংলাদেশের একজন দুর্ধর্ষ স্পাই হতে পারেন, কিন্তু কিছুতেই আমার কাছে পৌঁছতে পারবেন না। প্যাকেটটা দিয়ে দিলেই সসম্মানে বিদায় নেব আমরা, কেউ আপনার গায়ে হাত তুলবে না।'

'আগে অনিলের সাথে কথা বলতে হবে আমাকে,' বলল রানা মোলায়েম ভাবে। সিগারেটটা ফেলে দিল অ্যাশট্রেতে। 'আগামীকাল বিকেল নাগাদ একবার আসুন আপনারা। ততক্ষণে অনিলের বক্তব্য শুনে একটা কিছু সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারব আশা করছি।' হাই তুলল রানা। 'ঘুম পাচ্ছে বড়ো। যদি কিছু মনে না করেন, আমি এখন বিশ্রাম নিতে চাই।' লুইসার দিকে ফিরল

রানা। 'তুমি থাকবে, না এদের সাথে চলে যাবে, লুইসা?'

খপ করে রানার হাত ধরল লুইসা। 'প্লী...জ, রানা! দিয়ে দাও ওটা। তুমি বুঝতে পারছ না কেন...'

'বুঝতে আমি ঠিকই পারছি, সিনোরিনা। কিন্তু নিরপেক্ষতার খাতিরে অনিলের ভার্শান শোনা দরকার আমার। নইলে অবিচার করা হবে।'

উঠে দাঁড়াল রানা। সাথে সাথে কাঁধের উপর দড়াম করে আঘাত পড়ল। সামনের দিকে এক পা হোঁচট খেল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল গীয়ানের ভয়ঙ্কর মুখ। রিভলভারটা ধরা আছে রানার দুই চোখের ঠিক মাঝখানে। ট্রিগারের উপর চেপে বসে আছে তর্জনীটা।

'বসো!' গম্ভীর গলায় আদেশ করল গীয়ান।

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল লুইসা। ঝট করে ফিরল সিলভিওর দিকে।

'এটা কি হচ্ছে, সিলভিও? তুমি কথা দিয়েছিলে, ওর গায়ে হাত তোলা হবে না।'

'কি করব বলো? উনি যে এমন অবুঝের মত ব্যবহার করবেন সেটা আমার জানা ছিল না।' রানার চোখের দিকে চাইল সিলভিও। 'বসে পড়ুন, সিনর মাসুদ রানা। বল প্রয়োগের জন্যে আমি খুবই দুঃখিত, কিন্তু আপনি আপনার অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারছেন না এখনও। আপনি আমার বন্দী।'

'তাই নাকি?' বাম হাতে কাঁধটা ডলতে ডলতে বসে পড়ল রানা আবার। 'তাহলে আর নিরপেক্ষতার প্রশ্ন তুলতে গিয়েছিলেন কেন? আপনি নিজেই ঠেলে দিচ্ছেন আমাকে আপনার প্রতিপক্ষ শিবিরে।'

'আপনি ভুল বুঝছেন আমাকে,' চিকন হাসি খেলে গেল সিলভিওর ঠোঁটে। আমাদের হাতে সময় কম, অপেক্ষা করার

উপায় নেই। আপনি এইমাত্র বললেন, অনিলের সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেবেন। আমি দুঃখিত, সেটা সম্ভব নয়। মারা গেছে অনিল চ্যাটার্জী।'

ঠাণ্ডা, স্থির দৃষ্টিতে চাইল রানা সিলভিওর চোখের দিকে। তারপর মুচকে হাসল।

'এত সস্তাদরের ব্লাফে কাজ হবে না, সিনর। বেঁচে আছে অনিল চ্যাটার্জী।'

'হাসপাতালে রওনা হবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে মারা গেছে ও। ভিসকন্টির ফোন পেয়ে আমার লোকজন তৈরি ছিল আপনাদের গনডোলার জন্যে। একটা মোটরবোট ছিল গনডোলার অপেক্ষায়। মোটরবোটের ধাক্কায় ডুবে গেছে গনডোলা, ডুবে মরেছে অনিল। আপনার লোক দু'জন অবশ্য অনেক চেষ্টা করেছিল ওকে বাঁচাবার, কিন্তু লাভ হয়নি কোন, বালির বস্তার মত তলিয়ে গেছে সে পানির নিচে।'

মুচকে হাসল সিলভিও রানার বিস্মিত, হতবাক মুখের দিকে চেয়ে। বলেই চলল, 'আমাদের শক্তি, সামর্থ্য আর ক্ষমতা সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই আপনার, সিনর মাসুদ রানা, তাই অবাক হচ্ছেন এত সামান্যতেই। সারা ইউরোপে আমাদের অসাধ্য কিছুই নেই। যা খুশি তাই করতে পারি আমরা। যাক, যা বলছিলাম, অনিলকে নিয়ে আপনার দুই সঙ্গীকে গনডোলায় উঠতে দেখেই বুঝতে পারলাম প্যাকেটটা কোথায় লুকোনো আছে জানতে পেরেছেন অনিলের কাছ থেকে এবং সেটা সংগ্রহ করতেই গিয়েছেন আপনি। নইলে আপনিও যেতেন ওর সঙ্গে হাসপাতালে। ব্যস, বাকিটুকু খুবই সহজ কাজ। খুবই সাবধানে অনুসরণ করা হলো আপনাকে। সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না।' নিজের বিজয়ে আপন মনে হাসল সিলভিও। 'ভাল কথা, আপনার সঙ্গীদের কি হলো সে কথা ভেবে হয়তো উদ্বিগ্ন হচ্ছেন আপনি।

উদ্বেগের কিছুই নেই। নিরাপদে তীরে পৌঁছেচে ওরা, আমার লোকজন রীতিমত সাহায্য করেছে ওদের পারে উঠতে। বর্তমানে বহাল তবিয়তে আছে ওরা একটা বাড়িতে মাটির নিচের এক ঘরে। কিন্তু আপনি যদি অসহযোগিতা করেন, খুব বেশিক্ষণ ভাল থাকবে না ওরা। বুঝতে পেরেছেন? তুরুপের সব তাস এখন আমার হাতে, সিনর মাসুদ রানা। দয়া করে প্যাকেটটা বের করে দেবেন কি?'

কয়েক সেকেণ্ড সিলভিওর মুখের দিকে চেয়ে রইল রানা। দ্রুত চিন্তা চলেছে ওর মাথার মধ্যে। চেয়ে রয়েছে, কিন্তু দেখছে না রানা সিলভিওকে।

বোঝা গেল ভারত সরকার অনিলকে যাই মনে করুক, কিছু গোপন তথ্য সংগ্রহ করেছে অনিল একটা শক্তিশালী আন্তর্জাতিক দলের কাছ থেকে, এবং এই তথ্য নিয়ে সে ভারতে পৌঁছতে চাইছে। এদের জন্যে সেটা পুনরুদ্ধার করা এতই জরুরী যে তা করতে গিয়ে দু'পাঁচটা খুন হয়ে গেলেও পরোয়া নেই- অর্থাৎ, এই তথ্য ভারতে পৌঁছলে ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে এদের। তাই সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে এরা এ ব্যাপারে। এমন হতে পারে যে ভারতের প্রতি আনুগত্যের এটাই একমাত্র প্রমাণ অনিলের হাতে। এটা খোয়া গেলেই সব যাবে ওর। কোন অবস্থায় যেন প্যাকেটটা এদের হাতে না পড়ে তার ব্যবস্থা করা দরকার।

নীল প্লাস্টিকে মোড়া প্যাকেটটা ভেসে উঠল রানার মানসচক্ষে। তামার ফুলদানীতে রয়েছে ওটা। মোটেই নিরাপদ নয়। একটু মাথা খাটালেই বের করে ফেলবে সিলভিও। প্রথমে ওকে সার্চ করা হবে, কিন্তু যখন পাওয়া যাবে না তখন খুব সহজেই বুঝে নেবে সিলভিও যে এ বাড়িতে ঢোকার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে কোথাও লুকিয়েছে রানা ওটা। কয়েক সেকেণ্ড

একা ছিল রানা হলরুমে, নিশ্চয়ই ওখানেই কোথাও লুকোনো আছে ওটা।

হাতের তালু দুটো ভিজে এল রানার। অন্ধের মত এই ফাঁদে ধরা পড়ার জন্যে নিজের উপরই খেপে গেল সে। ওড্ডি আর সেই লোকটাকে এত সহজে হাল ছেড়ে দিতে দেখে আগেই সন্দেহ করা উচিত ছিল ওর। যাই হোক, পরিষ্কার বুঝে নিয়েছে সে, প্যাকেটটা এদের হাত থেকে রক্ষা করবার কোন উপায় নেই। তবু এদের মনোযোগ অন্যদিকে ফেরাবার চেষ্টা করতে হবে যতটা পারা যায়।

'সিনর মাসুদ রানা,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল সিলভিও, 'দিয়ে দিন প্যাকেটটা।'

'আমার কাছে যদি থাকত তাহলে কিছুতেই আপনাকে দিতাম না ওটা, কিন্তু যেহেতু নেই, দেয়া না-দেয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। কি বলেন?'

ঝট করে উঠে দাঁড়াল সিলভিও।

'প্রচুর সময় নষ্ট করেছি আমি ভদ্রতা রক্ষা করতে গিয়ে। আর নয়।' হাত বাড়াল। 'দিন প্যাকেট!'

'প্লীজ, রানা! তোমার তো কিছু না, দিয়ে দাও না ওটা, ঝামেলা চুকে যাক।' আবার রানার হাত চেপে ধরল লুইসা।

মৃদু হাসল রানা সিলভিওর চোখের দিকে চেয়ে।

'খামোকা মেজাজ গরম করে লাভ নেই, খোকা। আমার কাছে নেই ওটা।'

পপিনির দিকে চাইল সিলভিও। মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল। 'সার্চ করো একে।'

ঘাড়ের পেছনে রিভলভারটা ঠেসে ধরে গুঁতো দিল গীয়ান জোরে। 'উঠে দাঁড়াও।'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল রানা।

প্রত্যেকটা পকেট সার্চ করল পপিনি দ্রুত হাতে, মাথা নাড়ল, নেই। তারপর মৃদু চাপড় দিয়ে পরীক্ষা করল রানার সর্বাঙ্গ। রানার প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে স্টিলেটোটা বের করে আনল। তারপর সরে দাঁড়াল।

ঠিক এমনি সময়ে ঘরে ঢুকল ওড্ডি। রানার দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হাসবার চেষ্টা করল। চোখ দুটো জ্বলছে প্রতিহিংসায়। একটা চোখ ফুলে আছে বাতিস্তার ঘুসি খেয়ে।

'সর্বক্ষণ চোখে চোখে রেখেছিলে একে?' প্রশ্ন করল সিলভিও।

'হ্যাঁ, সিনর। ডি ফ্যাবোরির দেয়াল-মন্দিরটায় গিয়েছিল ও। 'শিকের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে কি যেন নিল। আমাদের দেখতে পেয়েই দৌড়াতে শুরু করল।'

'চ্যাটার্জী কি কোনদিন এই মন্দিরের কাছাকাছি গিয়েছিল?' জিজ্ঞেস করল সিলভিও।

উত্তর দিল গীয়ান। 'না, সিনর। কিন্তু ওই মেয়েলোকটা, জুলি মাযিনি, গিয়েছিল।'

'হ্যাঁ!' বলল ওড্ডি। 'কয়েকদিন আগে এই মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি আমি ওকে। আমি মনে করেছিলাম প্রার্থনা করছে বুঝি।'

'দৌড়াতে শুরু করার পর সিনর মাসুদ রানা কি ওটা কোথাও লুকোবার সুযোগ পেয়েছিল?'

'না। আমি আর রিক্কি পেছনেই ছিলাম, চোখের আড়াল হতে দিইনি।'

রানার দিকে ফিরল এবার সিলভিও। 'দিন প্যাকেট!'

'দেব না।' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা।

রাগে লাল হয়ে উঠল সিলভিওর ফর্সা চেহারা। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়াল কিছুক্ষণ। ফুলে উঠেছে নাকের পাতা।

বহু কষ্টে সামলে নিয়ে বলল, ‘প্রয়োজন পড়লে আমি কতটা কঠোর হতে পারি সে সম্পর্কে আপনার কোন ধারণাই নেই। শোনেন, মাসুদ রানা। নিজের অবস্থাটা আপনি মোটেই উপলব্ধি করতে পারছেন না। প্যাকেটটা পেতেই হবে আমার। কেউ আটকাতে পারবে না আমাকে।’ ঘরময় বার দুই পায়চারি করে এসে থামল আবার রানার সামনে। ‘আপনার কাছে আপনার সঙ্গীদের জীবনের মূল্য ঠিক কতখানি জানা নেই আমার। ওদের প্রাণের বিনিময়ে প্যাকেটটা ফেরত দিতে রাজি আছেন কিনা ভেবে দেখুন দুই মিনিট। প্যাকেটটা আমার হাতে তুলে দিলে ছেড়ে দেব আমি ওদের। যদি না দেন, এক্ষুণি হুকুম দেব আমি ওদের গুলি করে মেরে ফেলার জন্যে। বিশ্বাস করুন, ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করছি না আমি। যা বলছি ঠিক তাই করব আমি দুই মিনিট পর।’

এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে মনে মনে চমকে গেল রানা। ও আশা করেছিল ওর উপর নির্যাতন চালানো হবে, কিন্তু হঠাৎ মোড় ঘুরিয়ে যে বাতিস্তা আর ওস্তাদের উপর আক্রমণ করে বসবে সিলভিও, এটা কল্পনাও করতে পারেনি। যত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যই হোক, তার জন্যে দু’জন নির্দোষ লোকের প্রাণ নিতে দেবে না রানা এদের। কিন্তু আগে জানা দরকার ধোঁকা দিচ্ছে কিনা।

‘আপনার কথায় বিশ্বাস কি?’ প্রশ্ন তুলল রানা। ‘আমি কি করে জানব যে ওই দু’জন সত্যিই আপনার হাতে বন্দী হয়েছে? কি করে জানব যে সত্যি মারা গেছে অনিল চ্যাটার্জী? আমার সঙ্গীদের সাথে দেখা করবার আগে তো আমি কোন অবস্থাতেই দিতে পারি না ওটা আপনার হাতে। তাছাড়া দিলেই যে আপনি ওদের ছেড়ে দেবেন, তার কি নিশ্চয়তা?’

এতক্ষণে হাসি ফুটল সিলভিওর মুখে।

‘নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করা যাবে। ওদের সাথে আপনার দেখা হওয়ারও ব্যবস্থা করছি। কিন্তু মনে রাখবেন, সিনর মাসুদ রানা,

প্যাকেটটা না দিলে ওদের মরা মুখ দেখতে হবে আপনার। চলুন আমার সাথে। পথে কোন রকম গোলমাল করে লাভ নেই, পালাতে পারবেন না। যদি আমাদের হাত থেকে ছুটে বেরিয়ে যাওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব হয়ও, জেনে রাখবেন সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু ঘটবে আপনার দুই সঙ্গীর।’

‘পালাব না আমি,’ বলল রানা। ‘কোথায় আছে ওরা?’

‘কাছেই।’ লুইসার দিকে ফিরল সিলভিও। ‘তোমার আসার দরকার নেই, লুইসা। আমার কথা আমি রেখেছি। জীবনে কোনদিন এতখানি ধৈর্য ধরতে দেখোনি নিশ্চয়ই তুমি আমাকে? কিন্তু এর পরেও যদি সিনর মাসুদ রানা কোন রকম গোলমাল করবার চেষ্টা করে তাহলে দাঁত বেরিয়ে পড়বে আমার, আসল রূপ বেরিয়ে আসবে। সেটা তোমার দেখার দরকার নেই। যতটা সহ্য করেছি তার বেশি সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তুমি জানো। কাজেই আমরা বেরিয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই হোটেলে ফিরে যাবে তুমি।’ রানার দিকে ফিরল, ‘চলুন সিনর। আমি সত্যি বলছি, না মিথ্যে বলছি দেখুন এসে নিজ চোখে।’

দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল সিলভিও। পিছন পিছন চলল রানা। তার পিছনে রিভলভার হাতে ওড্ডি, গীয়ান আর পপিনি।

হলরূমের মাঝামাঝি এসে থমকে দাঁড়াল সিলভিও। তড়াক করে লাফ দিল রানার বুকের ভিতর কলজেটা। একটা দুটো হার্টবিট মিস হয়ে গেল। সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ঘরের চারপাশে চোখ বুলাল সিলভিও।

‘দাঁড়াও এক মিনিট!’ ধূর্ত হাসি ফুটে উঠল সিলভিওর ঠোঁটে। ‘এত সবের কোন দরকার না-ও পড়তে পারে। মন্দির থেকে এই বাড়ি পর্যন্ত ওড্ডির চোখে চোখে ছিলেন আপনি, প্যাকেটটা কোথাও লুকোবার সুযোগ ছিল না আপনার। কিন্তু এই হলরূমে কয়েক সেকেণ্ড আপনি একা ছিলেন। সেই কয়েক সেকেণ্ডের

মধ্যে ওটা এই ঘরেই কোথাও লুকিয়ে রাখা অসম্ভব নয়। আপনার কাছে যখন নেই, ওটা এ ঘরেই কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন ধরে নেয়াটা খুব একটা অযৌক্তিক কিছু হবে না। কি বলেন?'

বুকের ভিতর ধড়াশ ধড়াশ শুরু হয়ে গিয়েছে রানার। টের পেল ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে মুখটা রক্ত সরে গিয়ে। কিন্তু অসাধারণ মানসিক শক্তি বলে মুখের চেহারাটা ঠিক রাখল সে।

'খামোকা খোঁজাখুঁজি করে লাভ নেই, সিনর,' বলল রানা, 'সত্যি কথা বলতে কি, ভিড়ের মধ্যে আমার এক বন্ধুর পকেটে পুরে দিয়েছি আমি ওটা। আপনার স্যাঙাৎরা কেউ দেখতে পায়নি। আমার সঙ্গী দু'জনকে মুক্তি না দিলে ওটা পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই আপনার। দেরি না করে চলুন সেখানে যাওয়া যাক।'

ঝট করে ফিরল সিলভিও ওড্ডির দিকে।

'তোমাদের অলক্ষে ওটা পাচার করা সম্ভব ছিল এর পক্ষে?'

একটু ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল ওড্ডি। 'ছিল। ভিড়টা খুব ঘন ছিল। চোখের আড়াল করিনি ঠিকই, কিন্তু আমরা শুধু এর কাঁধ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছিলাম। হাত দেখতে পাইনি। নিচ দিয়ে কারো হাতে ওটা দিয়ে দেয়া এর পক্ষে অসম্ভব ছিল না।'

'খুবই ধূর্ততার সাথে কাজটা করেছেন, সিনর মাসুদ রানা,' কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল সিলভিও। 'কিন্তু তাতে অবস্থাটা এমন কিছুই পরিবর্তিত হচ্ছে না। প্যাকেটটা আপনার বন্ধুর কাছ থেকে সংগ্রহ করে আমার হাতে তুলে দেবেন আপনি।'

হাঁফ ছাড়ল রানা। 'তা দেব, কিন্তু তার আগে আপনার কথার সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে আমাকে।'

'তা ঠিক, ওদের দেখা পাবেন আপনি অল্পক্ষণের মধ্যেই।' আবার একবার ঘরের চারদিকে চোখ বুলাল সিলভিও। মৃদু হেসে

চাইল রানার চোখে। 'তবে এই ভিড়ের মধ্যে বন্ধুর পকেটে পুরে দেয়ার কাহিনীটা আপনার উর্বর মস্তিষ্কের ফসলও হতে পারে। তাছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে হঠাৎ এ গল্প শোনাবার? আমার মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়ার প্রয়াস হিসেবেও ধরতে পারি আমি ব্যাপারটা। কাজেই আমার মনে হয় রওনা হবার আগে আমাদের একবার এই ঘরটা পরীক্ষা করে দেখা দরকার।' গীয়ানের দিকে ফিরল। 'এক পা এদিক ওদিক নড়লে গুলি করবে।' এবার ওড্ডি আর পপিনিকে আদেশ করল, 'দেখো খুঁজে পাওয়া যায় কি না। বেশি সময় পায়নি ও। চট করে লুকিয়ে রাখা যায় এমনি কোন জায়গায় পেয়ে যাবে ওটা খুব সম্ভব। সাধারণ কোন জায়গায়। নাও, শুরু করো।'

হাল ছেড়ে দিল রানা। ভাগ্য অপ্রসন্ন। চেষ্টার ক্রটি করেনি সে।

এক্ষুণি খুঁজে পাবে ওরা ওটা। বাতিস্তা আর ওস্তাদের কি হবে তা হলে? ওর নিজের ভাগ্যেই বা কি আছে? এই তিনজনের মুখ চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার ব্যবস্থা হবে? নাকি মাল পেয়ে ছেড়ে দেবে ওদের? কি করবে?

আশ্চর্য দক্ষতার সাথে হলঘরের দু'পাশ থেকে খুঁজতে খুঁজতে মাঝখানে আসছে ওড্ডি আর পপিনি। তামার ফুলদানীটার খুব কাছে চলে এসেছে ওড্ডি। প্রতিযোগীর ঘোড়ার মুখে ভুল করে মন্ত্রী চেলে দাবা খেলোয়াড় যেমন বোর্ডের অন্যদিকে চেয়ে আল্লাকে ডাকে, নিছক ইচ্ছাশক্তির বলে প্রতিযোগীর মনোযোগ অন্যদিকে ফেরাবার চেষ্টা করে, রানার অবস্থা অনেকটা সেই রকম হলো। অন্যদিকে চেয়ে থাকার চেষ্টা করল সে, কিন্তু আড়চোখে ওড্ডির কার্যকলাপ লক্ষ না করেও পারছে না।

হঠাৎ ফুলদানীটা হাতে তুলে নিল ওড্ডি। ধড়াশ করে উঠল রানার বুক। মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে দেখল সে, ভিতরে হাত ঢুকাল

ওডিড, তারপর মুখটা উল্টো করে ঝাঁকি দিল। কিছুই বেরোল না ওটার মধ্যে থেকে।

তাজ্জব হয়ে গেছে রানা, দুই চোখে ওর অবিশ্বাস।

সত্যিই, কিচ্ছু নেই তামার ফুলদানীর ভিতর।

তিন

পাঁচ মিনিট তন্ন তন্ন করে খোঁজার পর ওডিড ঘোষণা করল, 'এঘরে নেই ওটা।'

কাঁধ ঝাঁকাল সিলভিও।

'থাকাটা অসম্ভব ছিল না। যাই হোক, খুঁজে দেখায় কোন ক্ষতি হয়নি আমাদের। এবার তাহলে আপনার সেই বন্ধুর কাছে দেয়ার কথাটা সত্য বলে ধরে নেয়া যায়, কি বলেন?'

শুকিয়ে আসা ঠোঁট ভিজাল রানা জিভের ডগা দিয়ে। পরিষ্কার বুঝতে পারছে গ্যাঁড়াকলে ফেঁসে গেছে সে এবার। প্যাকেটটা ফিরিয়ে না দিলে যে বাতিস্তা আর স্টেফানো মন্টিনিকে গুলি করে মারা হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু গেল কোথায় ওটা। কে নিল? ওডিড? শোবার ঘরে ঢোকার বেশ কিছুক্ষণ পরে এসে হাজির হয়েছিল ওডিড। হলরুমে ঢুকে প্যাকেটটা খুঁজে বের করে নেয়া সম্ভব ছিল ওর পক্ষে। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে চাইছে লোকটা? প্যাকেটটা গাপ করে দিয়ে নিজে কিছু টাকা হাতাবার তাল করেছে? তাই হবে। ও ছাড়া আর কে নিতে পারে প্যাকেটটা?

'চলুন, রওনা হওয়া যাক, সিনর মাসুদ রানা,' বলল সিলভিও। 'আপনার সহকর্মীদের সাথে দেখা করার পর আপনার

সেই বন্ধুর কাছ থেকে নিয়ে আসবেন প্যাকেটটা।'

'দাঁড়ান,' বলল রানা চট করে। বুঝতে পারছে সে ওডিড যদি প্যাকেটটা নিয়ে থাকে, আর একবার এই বাড়ির বাইরে কোথাও লুকিয়ে রাখবার সুযোগ পায়, তাহলে ও যে নিয়েছে তা প্রমাণ করবার উপায় থাকবে না আর। এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে প্যাকেটসহ ওকে হাতে-নাতে ধরা। নইলে আশা-ভরসা সব যাবে।

'কি ব্যাপার?' অসহিষ্ণু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সিলভিও।

'বন্ধুর কাছে দেয়ার গল্পটা বানানো,' বলল রানা। 'আপনি ঠিকই সন্দেহ করেছিলেন, এই ঘরেই লুকিয়ে রেখেছিলাম আমি প্যাকেটটা।'

কথাটা বলতে বলতে ওডিডের মুখের ভাব লক্ষ করল রানা। কিন্তু ওর কঠোর মুখে কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের আভাস ছাড়া আর কিছুই লক্ষ করা গেল না।

'আশ্চর্য!' তাজ্জব চোখে চাইল সিলভিও রানার মুখের দিকে। 'হঠাৎ এই অসময়ে কথাটা আমাকে বলে দিচ্ছেন কেন? স্বেচ্ছায় আপনার দর কষাকষির ক্ষমতা হারাচ্ছেন আপনি, সিনর মাসুদ রানা। এখুনি পেয়ে গেলে আপনার সঙ্গীদের ছেড়ে নাও দিতে পারি, এই সন্দেহ আসছে না আপনার মনে?'

'আসছে। কিন্তু তাতে কিছুই যায় আসে না। প্যাকেটটা খুইয়ে ফেলেছি আমি। এই ঘরে ঢোকার সাথে সাথে ওই দরজার নিচে আলো দেখে প্যাকেটটা আমি এই তামার ফুলদানীতে রেখে দিয়েছিলাম।'

ভুরু কুঁচকে ফুলদানীটার দিকে চাইল সিলভিও, তারপর চাইল ওডিডের দিকে। লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল ওডিড। ফুলদানীটা আবার হাতে তুলে নিয়ে ভিতরটা দেখল, তারপর উপুড় করে ঝাঁকি দিল বার কয়েক।

সবাই বুঝতে পেরেছে, তবু অনর্থক বলল ওড্ডি, 'কিছুই নেই এর ভেতর।'

'সময় নষ্ট করবার কৌশল খাটিয়ে যাচ্ছেন আপনি একটার পর একটা,' অনুযোগের সুরে বলল সিলভিও। 'এতে কি লাভ আশা করছেন আপনি আমার জানা নেই। আমি বিরক্ত হয়ে উঠছি ক্রমে। আপনি কি আশা করছেন যে আপনার বন্ধুরা এসে উদ্ধার করবে আপনাকে? কেন বিশ্বাস করছেন না আমার কথা? আমি তো বলছি ওরা আমার হাতে বন্দী, প্রমাণ দিতে নিয়ে চলেছি আপনাকে, তবু কেন...'

'ওটা আমি এই ফুলদানীর ভেতর রেখেছিলাম,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'আমরা যখন শোবার ঘরে কথা বলছিলাম তখন সরিয়েছে ওটা কেউ। আপনারা ওই ঘরের মধ্যেই ছিলেন, কাজেই আপনাদের পক্ষে ওটা হাতানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু একজন আছে যে সবার পরে ঘরে ঢুকেছিল, এই হলঘরে একা থাকবার সুযোগ পেয়েছিল। সে হচ্ছে এই লোকটা।' ওড্ডির দিকে ইঙ্গিত করল রানা মাথা ঝাঁকিয়ে।

আড়ষ্ট হয়ে গেল ওড্ডি। ভয়ঙ্কর হিংস্র হয়ে উঠল ওর মুখটা। ঠোঁট দুটো সরে গেছে দাঁতের উপর থেকে। দুই চোখে গোক্ষুরের বিষ।

শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল লুইসা। বিস্মিত দৃষ্টিতে বোঝার চেষ্টা করল এতক্ষণ এই ঘরে কি করছে লোকগুলো। এগিয়ে এল কয়েক পা।

'দেখুন, সিনর মাসুদ রানা,' কটমট করে চাইল সিলভিও রানার চোখে, 'বড় বিপজ্জনক খেলা খেলছেন আপনি। আমার দলের লোকের মধ্যে সন্দেহ ঢুকিয়ে গোলমাল পাকাবার চেষ্টা করে কোন লাভ হবে না। এসব অনেক পুরানো কৌশল। পচে গেছে। আপনার সঙ্গীদের কাছে যাচ্ছি আমরা এখন, ওখানে

আপনার মুখ দিয়ে কি করে সত্যি কথাটা বের করতে হবে জানা আছে আমার। চলুন।'

রানার মেরুদণ্ডের উপর রিভলভারের নল দিয়ে খোঁচা দিল গীয়ান।

'হাঁটো।'

নড়ল না রানা। শান্ত কণ্ঠে আবার বলল, 'কেউ নিয়েছে প্যাকেটটা। ওরই নেয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। রওনা হওয়ার আগে ওকে একবার সার্চ করলে আপনিই উপকৃত হবেন। আমি বাজি রাখতে পারি, এক্ষুণি ওকে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন প্যাকেটটা।'

বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে এল ওড্ডি দুই পা, ঠাশ করে প্রচণ্ড এক চড় মারল রানার গালে। মার খেয়ে এক পা পিছিয়ে গেল রানা। রিভলভারটা ওর শিরদাঁড়ার উপর ঠেসে ধরে স্মরণ করিয়ে দিল গীয়ান গোলমাল করলে কি ঘটবে।

'শুয়োরের বাচ্চা!' রাগে হাঁপাচ্ছে ওড্ডি। আবার একটা প্রচণ্ড চড় তুলল।

'থামো, ওড্ডি!' ধমকে উঠল সিলভিও। কঠোর হয়ে উঠেছে ওর মুখটা। দুই চোখে সন্দেহ। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সরে গেল ওড্ডি। 'আপনার অনুযোগের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছেন, সিনর? আপনার এ নালিশ মিথ্যে প্রমাণ হলে বড়ই দুঃখজনক ঘটনা ঘটবে আপনার কপালে। তখন আর ওকে বারণ করতে পারব না আমি, বারণ করবও না।'

'অত বকর বকর না করে সার্চ করে দেখো ওকে,' বলল রানা। 'গাধামি কোরো না। ওকে বিশ্বাস করতে যাবে কেন তুমি? ও যদি মনে করে প্যাকেটটা গায়েব করে দিয়ে কিছু ফালতু টাকা রোজগার করা যাবে, আমি তো বুঝি না তাহলে কেন ওটা তোমার হাতে তুলে দেবে ও।'

সতর্ক দৃষ্টিতে চাইল সিলভিও ওড্ডির দিকে। ওড্ডির তীব্র দৃষ্টিতে আক্রোশ- দাঁতে দাঁত চেপে কটমট করে চেয়ে রয়েছে রানার চোখের দিকে।

'প্যাকেটটা কি তোমার কাছে, ওড্ডি?' মোলায়েম কণ্ঠে প্রশ্ন করল সিলভিও।

'না। মিথ্যে কথা বলছে শুয়োরের বাচ্চা! দেখুন না, নিজের চোখেই দেখুন।'

ক্ষোভে দুঃখে একটার পর একটা পকেট উল্টে দেখাতে শুরু করল ওড্ডি। রাগে বিকৃত হয়ে গেছে ওর চেহারা। পকেট থেকে টুকিটাকি জিনিস বের করে ফেলতে শুরু করল মেঝের উপর।

সব পকেট দেখা হয়ে গেলে রানার দিকে ফিরল সিলভিও।

'এবার আর কিছু বলার আছে?'

'বেল্টের নিচে, প্যান্টের ভাঁজে, কিংবা শরীরের আর কোথাও লুকানো থাকতে পারে।' কথাটা বলল বটে, কিন্তু গলায় তেমন জোর পেল না রানা।

'খুঁজে দেখো।' পপিনিকে আদেশ করল সিলভিও।

যথেষ্ট ভদ্রতা ও সংকোচের সাথে, যেন বাঘের গায়ে হাত দিচ্ছে এমনি ভঙ্গিতে ওড্ডির সারা শরীর সার্চ করল পপিনি, তারপর সরে দাঁড়াল।

'কিছুই নেই।'

'এবার? আর কিছু?' ক্রোধ দেখতে পেল রানা সিলভিওর চোখে।

'আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে রেখে থাকতে পারে,' বলল রানা কণ্ঠস্বরটা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করে।

'আপনার তাই মনে হচ্ছে, তাই না?' হাসির চেষ্টা করল সিলভিও, কিন্তু সেটা মুখ ভেংচানোর মত দেখাল। 'আমার কি মনে হচ্ছে জানেন? আমার মনে হচ্ছে তুমি একটা তৃতীয় শ্রেণীর

গর্দভ। মিথ্যেবাদী কোথাকার?' রাগে হাত দুটো কাঁপতে শুরু করেছে সিলভিওর। 'আমার ভদ্রতাকে তুমি মনে করেছ দুর্বলতা। লুইসার অনুরোধে আমি চেয়েছিলাম ব্যাপারটা অপ্রীতিকর কোন ঘটনা ছাড়াই নিষ্পত্তি হোক। কিন্তু বীচিতে গুঁতো না দিলে বলদ সোজা হয় না। আমার আর কিছুই করবার নেই।' ওড্ডির দিকে ফিরল সিলভিও। 'ওড্ডি, যা ভাল বুঝবে তাই করবে তুমি, আমার আর কিছুই বলার নেই। হোটেলে চললাম আমরা। যেমনভাবে পারো, দুই ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে দেবে ওটা আমার কামরায়।'

'ঠিক আছে,' বলল ওড্ডি দাঁতে দাঁত চেপে। 'দু'ঘণ্টার মধ্যেই পাবেন ওটা।'

খপ করে লুইসার হাত ধরল সিলভিও, টান দিয়ে নিয়ে গেল দরজার কাছে। দরজাটা খুলে পিছন ফিরে চাইল রানার দিকে। রাগটা সামলে নিয়েছে অনেকটা।

'আমার সাথে গোলমাল ভারত সরকারের- তুমি বিদেশী গুপ্তচর, মাঝখান দিয়ে এর মধ্যে নোংরা নাকটা না গলালেই পারতে। এখন তোমাকে নিয়ে যাওয়া হবে তোমার সঙ্গীদের কাছে। ওখানে প্যাকেটটা ফেরত দিতে বাধ্য করা হবে তোমাকে। তারপর...' কথাটা শেষ না করেই মাথা ঝাঁকাল সিলভিও। 'চলি। খুব সম্ভব আর কোনদিন দেখা হচ্ছে না আমাদের।'

'দেখা না হওয়াটাই তোমার জন্যে মঙ্গল হবে,' বলল রানা।

কাঁধ ঝাঁকাল সিলভিও।

'অমন বড়াই আগেও বহুবার শুনেছি আমি। কান পচে গেছে শুনতে শুনতে। গুডবাই।'

চলে গেল সিলভিও লুইসাকে টেনে নিয়ে। দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

ঘেটো নুয়োভোর পিছনে একটা অন্ধকার বাড়ির সামনে এসে থামল গনডোলা। একটিও বাতি নেই। নিঝুমপুরী। দেখলেই বোঝা যায় বহু পুরানো আমলের বাড়ি। মনে হয় এখুনি হুড়মুড় করে ধসে পড়বে ঘাড়ের উপর।

গনডোলা বেঁধে ফেলল পপিনি ঝটপট। শিরদাঁড়ার উপর রিভলভারের খোঁচা দিল গীয়ান।

'নামো!'

ওড্ডি নেমে পড়েছে আগেই। পারে উঠে এল রানা পপিনির পিছন পিছন। চট করে ডাইনে বাঁয়ে চাইল সে একবার। খালটা ঘুটঘুটে অন্ধকার, কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ওর তীক্ষ্ণ কান কাছাকাছিই কোথাও ছপাৎ করে দাঁড় ফেলার শ পেয়েছে। একটা গনডোলা আসছে এইদিকেই।

শব্দটা ওড্ডির কানেও গেছে। কোন গোলমাল করবার আগেই খপ করে রানার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল সে বাড়ির ভিতর। ভ্যাপসা একটা দুর্গন্ধ এল রানার নাকে। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল গীয়ান বা পপিনি। পাঁজরের উপর রিভলভারটার উপস্থিতি অনুভব করল রানা আবার।

দেয়াল হাতড়ে একটা তাক থেকে মোমবাতি নিয়ে জ্বালল ওড্ডি। সরু একটা প্যাসেজ ধরে এগোল ওরা। কিছুদূর গিয়ে দরজা। দরজাটা খুলতেই সিঁড়ি দেখা গেল। নোংরা সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করেছে ওড্ডি।

পিছন থেকে ঠেলা খেয়ে নামতে বাধ্য হলো রানাও। বড়সড় একটা স্যাঁৎসেঁতে ঘর। তিনটে মোমবাতির আলোয় ম্লানভাবে আলোকিত।

দেয়ালের গায়ে পিঠ দিয়ে মেঝের উপর বসে আছে বাতিস্তা

আর ওস্তাদ স্টেফানো মন্টিনি। হাত-পা শক্ত করে বাঁধা।

ওদের দিকে চেয়েই মনটা দমে গেল রানার। ও আশা করেছিল এদের ব্যাপারে মিথ্যে কথা বলেছে সিলভিও, কিন্তু নিজের চোখে দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারল কি বিচ্ছিরি প্যাঁচে পড়ে গেছে সে। প্যাকেটটা ফেরত না দিলে ওর সামনেই হত্যা করা হবে এদের। অথচ...

'এই যে, সিনর! কি নাম যেন তোমার, তোমাকেও ধরে এনেছে? ছি ছি ছি ছি, জখম কোথায়? বিনা জখমেই আস্ত লোকটাকে ধরে ফেলল! কোন্ ইয়ারে পাস করেছ?'

'অনিলের খবর কি, ওস্তাদ?'

রানা দেখল, লাল হয়ে আছে ওস্তাদের টাক, মাথার একপাশে গভীর ক্ষতচিহ্ন। গালে একটা লম্বা চেরা দাগ, টপ টপ রক্ত ঝরছে সেখান থেকে জ্যাকেটের উপর! বাম বাহুর কনুইয়ের কাছে চিরে ফাঁক হয়ে আছে ইঞ্চি তিনেক জায়গা, মেঝেতে জমে আছে রক্ত, আরও জমছে।

বাতিস্তার অবস্থাও তেমন সুবিধের নয়। একটা চোখ বুজে গেছে মার খেয়ে, কালো হয়ে আছে জায়গাটা। কপালে কাটা চিহ্ন- খুব সম্ভব এই আঘাতেই জ্ঞান হারিয়েছিল ও। কাপড়টা ছিঁড়ে গেছে জায়গায় জায়গায়, গা দেখা যাচ্ছে, সেখানে আঁচড়ের দাগ।

'ছেলেটাকে বাঁচানো গেল না হে,' বলল ওস্তাদ। 'নৌকোটা উল্টে দিল ব্যাটারা, ডুবে গেল। চেষ্টা করলাম, কিন্তু তুলতে পারলাম না।'

'চোপ রাও!' দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে গেল ওড্ডি। দড়াম করে ওস্তাদের পাঁজরের উপর কষাল প্রচণ্ড এক লাথি। ব্যথায় কুঁকড়ে শুয়ে পড়ল ওস্তাদ একপাশে।

'খুব জোরে মারে তো ছেলেটা!' মুখ বিকৃত করে হাঁপাতে

হাঁপাতে বলল ওস্তাদ, 'কোন্ ইয়ারে পাস করেছ?' আবার লাথি তুলেছিল ওড্ডি, থেমে গেল রানার অস্বাভাবিক চিৎকার শুনে।

'খবরদার, ওড্ডি! বুড়ো মানুষটাকে মেরো না ওভাবে!'

রানার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল যে থমকে গেল ওড্ডি। কিন্তু ওর অসহায় অবস্থা দেখে ফিরে এল সাহস।

'মারলে কি করবে তুমি, শুনি?'

'তোমাকে মেরে মরব। গুলি করেও ঠেকাতে পারবে না আমাকে।'

একটা চেয়ার এনে ঘরের মাঝখানে রাখল পপিনি, হুকুম করল, 'বসো এখানে।'

রিভলভারের গুঁতো খেয়ে বসে পড়ল রানা। ওড্ডির ইঙ্গিতে রানার দুই হাত চেয়ারের পিছনে নিয়ে বেকায়দা ভঙ্গিতে চেপে ধরল পপিনি। দড়াম করে লাথি মারল ওড্ডি ওস্তাদের ভুঁড়ির উপর। তারপর রানার দিকে ফিরে হাসল।

অসহায়ভাবে গড়াগড়ি খাচ্ছে মেঝেয় স্টেফানো মন্টিনি। গ্যাঁজলা বেরিয়ে এসেছে মুখ দিয়ে।

পাগলের মত টানা-হেঁচড়া করল রানা, কিন্তু সাঁড়াশীর মত চেপে ধরে আছে পপিনি, ছাড়ানো গেল না ওর হাত। দাউ দাউ করে জ্বলল রানার চোখ। পরোয়া করল না ওড্ডি, এগিয়ে এসে দাঁড়াল রানার সামনে। চাপা উল্লাস ওর চোখেমুখে প্রতিহিংসার সুযোগ পেয়ে।

'আমাকে ফাঁসাবার চেষ্টা হচ্ছিল, না?' মোলায়েম কণ্ঠে বলল ওড্ডি। 'আমিই চুরি করেছি প্যাকেটটা, তাই না? ওটা কোথায় আছে দেখাচ্ছি তোমাকে।' হিপ পকেট থেকে একটা ময়লা গ্লাভ বের করে ডান হাতে পরল ওড্ডি। আঙুলগুলো বার কয়েক খুলল এবং বন্ধ করল। তারপর মুঠি পাকাল।

নিরাসক্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল রানা। যেন বুঝতে পারেনি কি

ঘটতে চলেছে। কিন্তু ভিতর ভিতর তৈরি হয়ে গেছে সে। শরীর নড়াতে পারছে না ঠিকই, কিন্তু মাথাটা নড়াতে পারবে। ঘুসিটা কাটাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে ও।

'তোমাকে খানিক মেরামত করা হবে এখন,' শান্ত কণ্ঠে বলল ওড্ডি। 'এই রকম...'

সাঁই করে ঘুসি চালাল ওড্ডি। বিদ্যুৎ বেগে সরে গেল রানা বাম পাশে, ইঞ্চি দেড়েক। কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘুসিটা। ভারসাম্য হারিয়ে সামনে ঝুঁকে এল ওড্ডি। এক পায়ের হাঁটু দিয়ে ওর তলপেটে গুঁতো মারল রানা, অপর পায়ে লাথি মারল ওর পায়ের গোড়ালিতে। ছিটকে বাতিস্তার পায়ের কাছে পড়ল ওড্ডি। প্রাণপণে জোড়া পায়ে লাথি চালাল বাতিস্তা। জায়গামত পড়লে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঘুমিয়ে যেত ওড্ডি, কিন্তু শরীর বাঁকিয়ে মুখটা সরিয়ে নিল সে, লাথিটা পড়ল ওর বুকের উপর, মেঝের উপর গড়িয়ে চলে গেল সে চার-পাঁচ হাত। ওড্ডির সুবিধের জন্যে একটু দূরে সরে গিয়েছিল গীয়ান, এক লাফে চলে এল কাছে, রিভলভারের ব্যারেল দিয়ে মারল রানার চোয়ালের উপর। মুখটা সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল রানা, তাতে আঘাতের পরিমাণ কমল কিছুটা, কিন্তু তবু যতটা লাগল তাতেই বোঁ করে ঘুরে উঠল ওর মাথা। আবছা ভাবে অনুভব করল উঠে দাঁড়াচ্ছে ওড্ডি। অনর্গল গালি বেরোচ্ছে ওর মুখ থেকে।

বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল ওড্ডি রানার উপর। চুল ধরে মুখটা উঁচু করল, নাক-মুখ ভর্তা করে দেয়ার জন্যে প্রকাণ্ড এক ঘুসি তুলল। কিন্তু খপ্ করে ধরে ফেলল গীয়ান ওর হাতটা।

'এখন না, পরে।' বলল গীয়ান। 'ওর বন্ধুর সাথে দেখা করতে হবে ওকে। এখনই জখম করা ঠিক হবে না, দোস্ত।'

এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিল ওড্ডি। পিছিয়ে গেল এক পা। জ্বলছে চোখ দুটো, মুখটা খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে। সামলে

নেয়ার চেষ্টা করল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর মনে হলো গীয়ানের বক্তব্যের অর্থ বুঝতে পারল সে, ঝট করে পিছন ফিরল নিজেকে নিবৃত্ত করবার জন্যে।

'প্যাকেটটা ফেরত দিচ্ছ?' কানের কাছে মোলায়েম কণ্ঠে বলল গীয়ান।

মাথাটা ঘুরছে এখানো, কিন্তু তারই মধ্যে পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা, ও যে জানে না প্যাকেটটা কোথায় একথা বিশ্বাস করবে না এরা। শোল্ডার হোলস্টার থেকে একটা রিভলভার বের করে ফেলেছে ওড্ডি। বাতিস্তার দিকে তাক করে ধরল সেটা। ওর চোখের দিকে চেয়ে পরিষ্কার বুঝতে পারল রানা, ওর একটি মুখের কথার উপর নির্ভর করছে বাতিস্তার বাঁচা আর মরা। 'না' বলার সাথে সাথেই গুলি করবে ওড্ডি।

যে করে হোক সময় নিতে হবে এখন। আর কোন উপায় নেই।

'ঠিক আছে,' বলল রানা, 'এনে দেব ওটা আমি।'

কাছে এসে দাঁড়াল ওড্ডি। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'এই তো, লক্ষ্মী ছেলে। কোথায় আছে ওটা?'

'সারাগাত হোটেলে উঠেছে আমার বন্ধু। ওখানেই আছে।'

'কি নাম ওর?'

'গামাল মুস্তাফা,' বলল রানা অম্লান বদনে।

পপিনির দিকে ফিরল ওড্ডি।

'সারাগাত হোটেলে ফোন করে জেনে এসো এই নামে কোন লোক আছে কিনা।'

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল পপিনি। পায়চারি শুরু করল ওড্ডি। স্থির, নিষ্কম্প হাতে রিভলভার তাক করে ধরে দাঁড়িয়ে রইল গীয়ান পাথরের মূর্তির মত। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল পপিনি।

'আছে। আজই সন্ধ্যায় উঠেছে ওই হোটেলে। ঘুমাচ্ছে নিজের ঘরে, তেমন জরুরী কিছু না হলে নাকি তাকে ডাকা যাবে না।'

রানার দিকে ফিরল ওড্ডি।

'প্যাকেটটা নিয়ে আসবে তুমি ওর কাছ থেকে। গীয়ান আর পপিনি যাবে তোমার সাথে। কোন রকম গোলমাল করলেই মারা যাবে এই দু'জন। আমি নিজ হাতে গুলি করব। বুঝতে পেরেছ?'

'কঠিন কিছুই নেই এর মধ্যে। বুঝেছি।'

'নিয়ে যাও একে,' বলল ওড্ডি গীয়ানকে। 'হোটেলের বাইরে অপেক্ষা করবে তোমরা। দশ মিনিটের মধ্যে ও যদি হোটেল থেকে না বেরোয় পপিনিকে পাঠিয়ে দেবে আমার কাছে। এদের খতম করে দিয়ে পরবর্তী প্ল্যানের কথা চিন্তা করা যাবে।'

'চলো। উঠে পড়ো, চাঁদ।' রিভলভার দিয়ে উঠে দাঁড়াবার ইঙ্গিত করল গীয়ান।

উঠে দাঁড়াল রানা। টলে উঠল মাথাটা ঘুরে ওঠায়। সামলে নিয়ে ফিরল বাতিস্তা আর ওস্তাদের দিকে।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে ওরা। অনিশ্চিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে রানার মুখের দিকে। হঠাৎ হাসল ওস্তাদ। কাঁধ দিয়ে থুতনি চুলকে নিয়ে বলল, 'আমাদের জন্যে ভেবো না, ক্যাপ্টেন। তোমার কাজ তুমি করে যাও।'

'আমি ফিরে আসছি,' বলল রানা, কিন্তু গলায় তেমন জোর পেল না।

দ্রুত চিন্তা করছে রানা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে। এখন একমাত্র ভরসা কোন সুযোগে এই দু'জনকে চমকে দিয়ে কাবু করে ফেলে ফিরে এসে ওড্ডিকে কাবু করা। কিন্তু কিভাবে? হোটেলে রেখে আসা পিস্তলটার কথা মনে এল রানার। কিন্তু যে জিনিস এই ট্যুরিস্ট ঠাসা শহরে ব্যবহার করতে পারবে না সে,

সেটা থাকা না থাকা সমান কথা। সবচেয়ে বড় কথা, রানার ক্ষমতা সম্পর্কে মোটামুটি পরিষ্কার ধারণা হয়ে গেছে গীয়ানের, ওকে অবাক করে দেয়া, কিংবা অতর্কিতে কিছু করে পরাজিত করা এখন আর অত সহজ হবে না। সর্বক্ষণ সতর্ক রয়েছে সে। একবিন্দু আলগা করছে না শিরদাঁড়ার উপর রিভলভারের চাপ। ওটা যতক্ষণ ওই জায়গায় ঠেসে ধরা আছে ততক্ষণ আচমকা কিছু করে বসা ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

দরজার কাছে এসে পিছন থেকে রানার কলার চেপে ধরল গীয়ান, টেনে থামাল।

'দাঁড়াও! পপিনি, দরজা ফাঁক করে আগে বাইরেটা দেখে নাও একবার।'

এগিয়ে গেল পপিনি, আস্তে করে খুলল দরজা, বাইরেটা দেখে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। কেউ নেই।'

ইতিমধ্যে একবার খেলে গেছে রানার মাথায় ঝট করে একপাশে সরে গিয়ে রিভলভারটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করবে কিনা, কিন্তু কাজটা মারাত্মক বিপজ্জনক হবে মনে করে আপাতত মুলতবী রেখেছে। কিন্তু স্থির করেছে রানা, গনডোলায় ওঠার সময় সুযোগ আসবে একটা। কোনভাবে নৌকোটা দুলে ওঠার সাথে সাথে যদি...

তারাজ্বলা মুক্ত আকাশের নিচে চলে এসেছে ওরা, আর কয় পা গেলেই খালের পাড়, এমনি সময় চমকে উঠল রানা একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে।

'নড়েচ কি মরেচ! যে যেমন আচো ডেঁড়িয়ে থাকো! এটা আসল পেস্তল বাওয়া, খেলনা নয়।'

পাঁই করে ঘুরল গীয়ান। সাথে সাথে ঠকাশ করে শব্দ হলো। চাপা একটা প্রায়-অস্ফুট আর্তনাদ বেরোল গীয়ানের মুখ থেকে। ছিটকে মাটিতে পড়ল রিভলভার। বাম হাত দিয়ে ডান হাতটা

চেপে ধরেছে সে।

দড়াম করে ওর সোলারপ্লেক্সাসে ঘুসি মারল রানা, কুঁজো হয়ে মাটিতে বসে পড়ল গীয়ান, তারপর এক লাথিতেই শুয়ে পড়ল সটান।

পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছে পপিনি। আর কিছু না বুঝুক, 'পেস্তল' কথাটার মানে সে ঠিকই বুঝেছে। দেয়ালের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল গিলটি মিয়া।

'এ শালার কপালে একটা আলু তুলে দোব, স্যার?'

'না! দাঁড়াও!' মাটি থেকে গীয়ানের রিভলভারটা তুলে নিতে নিতে বলল রানা।

রানা জানে পপিনির কাছে রিভলভার আছে। এতক্ষণে বেরিয়ে পড়ত সেটা যদি না গিলটি মিয়ার খেলনা পিস্তলটাকে সে আসল পিস্তল বলে ভুল করত। টের পাওয়ার আগেই কাবু করতে হবে ওকে। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াবার ইঙ্গিত করল রানা পপিনিকে। ভয়ে ভয়ে পিছন ফিরল পপিনি। ঠকাশ করে রিভলভারের বাঁট পড়ল ওর মাথার পিছনে। বিনা দ্বিধায় জ্ঞান হারাল সে। ধড়াশ করে মাটিতে পড়বার আগেই ওকে ধরে আস্তে করে শুইয়ে দিল রানা গীয়ানের পাশে। পকেট থেকে বের করে নিল রিভলভার।

চার

'ওফ, বড় জব্বর মার মেরেচেন, স্যার; আমার মাতা হলে ফেটে একেবারে চৌচির হয়ে যেত। এদের মাতাও খুব শক্ত, স্যার। একাবারে ঝুনো নারকেল!'

খেলনা পিস্তল হাতে এগিয়ে এল গিলটি মিয়া। আসল পিস্তল ছোঁবে না বলে বি. সি. আই. গান-স্পেশালিস্টকে অনেক তেল মেরে ওর জন্যে এই পিস্তল তৈরি করিয়ে দিয়েছে রানা। ভায়োলেন্স মোটেই পছন্দ করে না গিলটি মিয়া, তাছাড়া আসল পিস্তলের কড়া আওয়াজটা একেবারেই সহ্য হয় না ওর, তাই নিঃশব্দ এয়ারগানের ব্যবস্থা। গুলি আছে ঠিকই, ছয়টা গুলি ভরা যায় এতে, তবে সেগুলো সত্যিকার অর্থেই গুলি, অর্থাৎ কাঁচের মার্বেল। এটা পেয়ে খুশি মনে এতই প্র্যাকটিস করেছে যে এখন তিরিশ ফুট দূর থেকে মাকড়াসার ডিম ফাটিয়ে দিতে পারে গিলটি মিয়া এক গুলিতে। পোয়াটেক ওজনের ঢিলের সমান এই গুলির আঘাত। নেহায়েত খারাপ নয়। সবচেয়ে আকর্ষণীয় এর চেহারাটা। বহু দুর্ধর্ষ লোকের পিলে চমকে দিয়েছে গিলটি মিয়া এই পিস্তল দেখিয়ে।

'তুমি হঠাৎ কোত্থেকে হাজির হলে, গিলটি মিয়া?' খুশিতে কেঁপে গেল রানার কণ্ঠস্বর। আচমকা এই ভাবে উদ্ধার পেয়ে যাবে কল্পনাও করতে পারেনি সে।

'সে অনেক হিস্টিরি, স্যার। প্রথম গেলাম আলফ্রেডো হোটেলে...'

'আচ্ছা, ঠিক আছে গিলটি মিয়া, পরে সব শুনব। দু'জনকে বন্দী করে রেখেছে ওরা এই বাড়িতে, ওদের বের করে আনি আগে!' গিলটি মিয়াকে সাথে আসতে দেখে বলল, 'তুমি এখানেই থাকো। এরা কেউ সামান্য একটু নড়ে উঠলেই...'

'ঠকাশ।' একগাল হাসল গিলটি মিয়া। 'বুজতে পেরেচি।'

দ্রুত নিঃশব্দ পায়ে ফিরে এল রানা সিঁড়ির কাছে। কান পেতে শুনল, হেঁটে বেড়াচ্ছে ওড্ডি।

সাবধানে নামতে শুরু করল সে। একটু আওয়াজ হলেই সতর্ক হয়ে যাবে ওড্ডি। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে শব্দ না করে নামা

বড় শক্ত। যতটা সম্ভব দেয়ালের গা ঘেঁষে নামছে রানা, প্রতিটা পদক্ষেপ ফেলার আগে চাপ দিয়ে দেখে নিচ্ছে।

মাঝামাঝি নামতেই দেখতে পেল রানা ঘরের ভিতরটা।

ঘরের এমাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত পায়চারি করছে ওড্ডি। প্যান্টের দুই পকেটে দু'হাত পোরা। বাঘের নজরে দেখছে বাতিস্তা আর ওস্তাদের দিকে।

মৃদু হাসল রানা। আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাবে ওড্ডির ওকে দেখে। আরও দু'পা নামল সে নিচে, তারপর রিভলভারটা ধরল তাক করে।

'গোলমাল করলে মারা পড়বে, ওড্ডি!' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা।

গুলি খাওয়া বাঘের মত লাফ দিল ওড্ডি। পকেট থেকে হাত বের করে আনছিল, কিন্তু রানার হাতে নাকবোঁচা রিভলভারটা দেখেই জমে গেল বরফের মত। ভীতি দেখা দিল ওর চোখে। দু'ফাঁক হয়ে গেল ঠোঁট।

'তোমাদের খেলা শেষ, এবার আমার পালা,' বলল রানা নিচে নামতে নামতে।

শুয়ে ছিল, তড়াক করে উঠে বসল পাগলা ওস্তাদ। বিস্মিত দৃষ্টিতে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখল রানাকে।

'আরে! তুমি দেখছি দারুণ ক্যাপ্টেন হে! হারা গেম জিতে বসে আছো! কোন্ ইয়ারে পাস করেছ?'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল বাতিস্তা। অবাক চোখে চেয়ে রয়েছে রানার দিকে।

ওড্ডিকে একটু নড়ে উঠতে দেখেই দাঁড়িয়ে পড়ল রানা।

'খবরদার, ওড্ডি! মানুষ খুন করার অভ্যাস আছে আমার। এতটুকু ইতস্তত করব না গুলি করতে।'

স্থির হয়ে গেল ওড্ডি। একবিন্দু কাঁপল না রানার হাত, এক

মুহূর্তের জন্যে সরল না ওর চোখ ওড্ডির উপর থেকে। সোজা এসে দাঁড়াল পাঁচ হাত দূরে।

'ঘুরে দাঁড়াও,' বলল রানা।

'উচিত শিক্ষা দেব আমি তোকে, শুয়োরের বাচ্চা!'

'ঘুরে দাঁড়াও!'

ধীরে ধীরে ঘুরল ওড্ডি। রিভলভারটা উল্টো করে ধরে নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এল রানা। ঠাশ্ করে আওয়াজ হলো রিভলভারের বাঁটের সাথে ওড্ডির খুলির ঠোকাঠুকিতে। ঘোঁৎ করে একটা শব্দ বেরোল ওড্ডির নাক দিয়ে, হুড়মুড় করে পড়ল চেয়ারের উপর, ওখান থেকে সটান মেঝেতে। জ্ঞান আছে কি নেই পরীক্ষা করে দেখবার প্রয়োজন বোধ করল না রানা, মাথার পিছনে রিভলভারের বাঁট পড়তেই হাতে যে ঝাঁকুনি অনুভব করা গেল, তাতেই বুঝে নিয়েছে সে, অন্তত দুই ঘণ্টার জন্যে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় এর ব্যাপারে।

'গুড!' খুশি হয়ে উঠল ওস্তাদ। 'ওই ছেলে দুটোকে কাবু করলে কি করে?'

ওড্ডির ছুরিটা বের করে নিয়ে ঘ্যাচ ঘ্যাচ কেটে দিল রানা ওস্তাদ আর বাতিস্তার বাঁধন।

'আমি কাবু করিনি,' বলল রানা। বেরিয়েই দেখি আমার এক বন্ধু এসে হাজির। ওরই সাহায্যে কাবু করা গেছে ওদের।'

'এই জায়গাটা চিনল কি করে আপনার বন্ধু?' জিজ্ঞেস করল বাতিস্তা হাত ডলতে ডলতে।

'জানি না। শুনব এখন সব। কেমন বোধ করছ? খুব বেশি জখম হওনি তো?'

'আরে না,' উত্তর দিল ওস্তাদ, 'বাতিস্তাকে চেনো না তুমি। বললে এক্ষুণি এইট-হাণ্ডরেড মিটার স্প্রিন্ট দিয়ে আসবে একটা। স্পোর্টসম্যানকে কাবু করা কি এতই সহজ? তবে তুমি ঠিক সময়

মত এসে পৌঁছেচ। এই ছেলেটা ভাল না। স্পোর্টসম্যান স্পিরিট নেই। এর সাথে মিশো না তোমরা কোনদিন।'

'চলুন, ওস্তাদ, ওই দুটোকে নিয়ে আসি এখানে।' বলেই রওনা হলো রানা সিঁড়ির দিকে। 'তিনটেকে এখানে বেঁধে রেখে বেশ কয়েকটা কাজ সারতে হবে আমাদের। দু'ঘণ্টা পর টনক নড়বে সিলভিও পিয়েত্রোর। হন্যে হয়ে খুঁজতে শুরু করবে আমাদের। তার আগেই আমাদের কাজ গুছিয়ে নিয়ে কেটে পড়তে হবে।'

গিলটি মিয়ার পাখির মত শরীর আর হনুমানের সমান উচ্চতা দেখে হেসে ফেলল বাতিস্তা। রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'ইনিই আপনার উদ্ধারকারী বন্ধু?'

'হেসো না, বাতিস্তা!' হঠাৎ রেগে গিয়ে ধমকে উঠল ওস্তাদ। 'মানুষের জন্মগত ত্রুটি নিয়ে হাসতে হয় না। ওর তো কোন হাত নেই। নিশ্চয়ই ঈশ্বর ওকে অন্য কোন ভাবে ক্ষতি পূরণ করে দিয়েছে। সেখানে তুমি বা আমি ওর কাছে নস্যি।'

গনডোলায় লম্বা রশি পাওয়া গেল। গীয়ান আর পপিনির জ্ঞানহীন দেহ ধরাধরি করে নিয়ে এল ওরা বাড়ির ভিতর। তিনজনকে একসাথে বাঁধছে বাতিস্তা, ওস্তাদ পরীক্ষা করে দেখছে বাঁধন কোথাও আলগা রয়ে যাচ্ছে কিনা।

চেয়ারে বসে গিলটি মিয়ার দিকে ফিরল রানা।

'হিস্টিরি রেখে খুব সংক্ষেপে রিপোর্ট দাও দেখি?' রানা বলল, 'হাতে সময় নেই।'

নিরতিশয় হতাশ হলো গাল-গল্পপ্রিয় গিলটি মিয়া। ঘণ্টা দুয়েকের মেটেরিয়াল রয়েছে ওর পেটে, দুই মিনিটে যদি সব বলে ফেলতে হয় তাহলে দারুণ লস্। ব্যাজার মুখে ঘাড়ের পিছনটা চুলকাল।

'সেই হোটেলে গিয়ে একটা চিটি পেলুম। নকল অনিল

চ্যাটার্জীর লেকা। ভয়ানক বিপদ দেকে সে চলে গেচে জেনেভা, একটা হোটেলের নাম দিয়েচে, আপনাকে বলেচে যেন সেখেনে দেকা করেন। ছবিটা দেকালুম কাউন্টারে, চিনতেই পারল না ব্যাটা।'

'হুম!' বলল রানা। 'সারা ইউরোপে ঘোড়দৌড় করাতে চেয়েছিল ওরা আমাকে। যাই হোক, খবরটা জেনেই ফিরে এলে তুমি। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এলে কি করে?'

'প্যাসেঞ্জারি পেলেনে উটিনি তো। যেটাতে গিয়েচি, ওটারই ডাইবারকে বললুম, আবার ফেরত লিয়ে চলো। ফিরে এসে মালপত্তর রাকতে গিয়েছিলাম বাসায়, ও বাবা, পাঁচ মিলিটও যায়নি, ঢুকল চার-পাঁচজন পেস্তলধারী। তাদের পিচু পিচু এল দুপুরের সেই মেয়েটা, আর তারই মত দেকতে এক ভদ্দরলোক।'

'তুমি কি করলে?'

'আমি তো আগেই নুকিয়ে পড়েচি একটা ওয়ারড্রোবের ভেতর। ওফ্, কি বলব, স্যার, দশ মিলিট পরে দেকি নিভ্ভয়ে সুড়সুড় করে হেঁটে বেড়াচ্চে আমার সারা গায়ে আট-দশটা তেলচোট্টা (আরশোলা)!' শিউরে উঠল গিলটি মিয়া ওগুলোর কথা একবার ভাবতেই। 'ভয়ে, ঘেন্নায় আরাকটু হলেই চিল্লিয়ে উটতাম, এমন সোমায় ঘরে ঢুকলেন আপনি। সাবদান করবারও সোমায় পেলুম না, দেকলুম একটা ফুলদানীর মদ্যে কি যেন ছেড়ে দিলেন আপনি...'

'ওটা কি তুমিই সরিয়েছিলে ওখান থেকে?' খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল রানার মুখটা।

'তবে আর কে?' একগাল হাসল গিলটি মিয়া। 'কিচু মনে করবেন না, স্যার, ওটার জন্যে আপনাকে এমন মার খেতে হবে জানলে আর ইস্পশ্য করতুম না। কিন্তুক দরজার গায়ে কান পেতে আপনাদের কতা শুনতে গিয়ে দেকি বার বার প্যাকেট,

প্যাকেট করচে একটা লোক। আমার মনে হলো ও জায়গাটা মোটেই নিরাপদ নয়, তাই তুলে নিলুম।'

'তোমার কাছেই আছে ওটা?'

'নিচ্চয়!' পকেট থেকে নীল প্যাকেটটা বের করে দিল রানাকে। 'আপনার জিনিস বলে আর খুলিনি ওটা, যেমন ছিল তেমনি আচে।'

'ওয়েল ডান, গিলটি মিয়া!' হাত বাড়িয়ে প্যাকেটটা নিল রানা। রানার প্রংশসায় একেবারে কৃতার্থ হয়ে গেল গিলটি মিয়া। হাসি গিয়ে ঠেকল দু'দিকের দুই কান পর্যন্ত।

'তারপর ডেঁড়িয়ে রইলুম বাইরে। আপনাকে কোতাউ নিয়ে চলেচে বুজতে পেরে পিচু নিলুম। বহু কষ্টে হাজির হয়েচি এই ভূতুড়ে বাড়িতে। নৌকো একখানা চুরি করা সোজা, কিন্তুক ওটাকে এ পয্যন্ত চালিয়ে নিয়ে আসা- ওরে-ব্বাপ! তার পরের ঘটনা তো নিজের চোকেই দেকলেন।'

উঠে দাঁড়াল রানা। বাঁধনগুলো পরীক্ষা শেষ করে প্যান্টের পিছনে হাত মুছল ওস্তাদ, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ফিরল রানার দিকে।

'এবার কি?'

'চলুন, আগে গনডোলায় ওঠা যাক।'

গনডোলায় উঠে পড়ল সবাই। বৈঠা তুলে নিল বাতিস্তা। রওনা হয়ে গেল ওরা।

খুব সংক্ষেপে যা যা ঘটেছে বলল রানা ওদের। তারপর ফিরল বাতিস্তার দিকে।

'জুলির হত্যাকারী কে জানতে পেরেছি আমি, বাতিস্তা।'

'কে!' থেমে গেল বাতিস্তার হাতের বৈঠা।

'নির্যাতন করেছিল গীয়ান, কিন্তু ওকে খুন করেছে ওডিড।'

'আমি এখানেই নেমে যাব, সিনর।' গনডোলাটা বেঁকে গেল

তীরের দিকে। 'দয়া করে বাধা দেবেন না আমাকে।'

'না। বাধা দেয়ার অধিকার আমার নেই।' নৌকোটা তীরে ভিড়তেই ওড্ডির রিভলভারটা এগিয়ে দিল রানা বাতিস্তার দিকে।

'ওটা দরকার হবে না, সিনর। কোথায় আপনার সাথে দেখা করব?'

'ব্যবহার করো আর না করো, রাখো এটা সাথে।' জোর করে গুঁজে দিল রানা রিভলভারটা বাতিস্তার হাতে। 'আগামী দেড় ঘণ্টার মধ্যে ভেনিস ছেড়ে চলে যাচ্ছি আমি। পারলে ঘণ্টাখানেক পর ওস্তাদের বাসায় এসো একবার।'

অন্ধকারে মিলিয়ে গেল বাতিস্তার সুঠাম, দীর্ঘ দেহ।

বৈঠা তুলে নিল ওস্তাদ। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আমার কি কাজ বললে না, ক্যাপ্টেন?'

'আর কিছুদূর গিয়ে আমরা দু'জন নেমে যাব। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পৌঁছব আমরা আপনার বাসায়। আজ রাতেই পালাতে হবে আমাদের। মোটরবোটের ব্যবস্থা করা কি সম্ভব হবে এত রাতে?'

'ব্যবস্থা হয়ে বসে আছে। সুন্দর একটা বোট ঠিক করেছি তোমার জন্যে। এক কথায় রাজি হয়ে গেছে ছেলেটা। আমারই সাগরেদ।'

'তাহলে আপনার আপাতত আর কোন কাজ নেই, ওস্তাদ। এইখানেই নামব আমরা। আপনি সোজা বাসায় ফিরে গিয়ে অপেক্ষা করুন, আমরা আসছি।'

'তোমরা চলেছ কোথায়?'

'বাসায়। ওখান থেকে কয়েকটা জরুরী ফোন সারতে হবে আমার। এক ঘণ্টার বেশি দেরি হবে না।'

ঘ্যাশ্শ্ করে তীরে ভিড়ল গনডোলা। গীয়ানের রিভলভারটা এগিয়ে দিল রানা ওস্তাদের দিকে।

'এটা সাথে রাখুন, ওস্তাদ।'

'আরে দূর!' একগাল হাসল ওস্তাদ। 'পাগল নাকি তুমি? মানুষ খুন করতে পারব না আমি। রেডি, অন্ ইয়োর মার্ক, গেট-সেট বলে ঠাশ করে শূন্যে ফাঁকা আওয়াজ করা পর্যন্ত আমার দৌড়। ও জিনিস আমার কোন কাজে লাগবে না।'

নেমে পড়ল রানা।

'আপনাকে অনেক কষ্ট দিলাম, ওস্তাদ।'

'কষ্ট! বেশি ভদ্রতা দেখানো হচ্ছে, না? এমন এক বক্সিং লাগাব, একেবারে খালের মাঝখানে গিয়ে পড়বে! কোন্ ইয়ারে পাস করেছ?'

পাগলা ওস্তাদকে আর না ঘাঁটিয়ে এগোল রানা ও গিলটি মিয়া।

মিনিট পাঁচেক দ্রুত হেঁটে বাসায় পৌঁছল ওরা।

এখানে ফিরে এসেছে রানা নিরিবিলিতে আগামী প্ল্যান ঠিক করবার জন্যে। খুবই দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে ওকে কয়েকটা ব্যাপারে। তার জন্যে দরকার এমন একটা নিরাপদ জায়গা যেখানে চিন্তার সূত্র ছিন্ন করবে না কেউ। এই বাড়িটাই এ মুহূর্তে ওর জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা।

গিলটি মিয়াকে এক কাপ চা খাওয়াবার অনুরোধ করে জানালার সব ক'টা কার্টেন টেনে দিল রানা, টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে বসল গিয়ে টেবিলে, পকেট থেকে বের করল নীল প্যাকেটটা।

নিজের অজান্তেই মৃদু হাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে। এরই জন্যে এতকিছু। এরই জন্যে হন্যে হয়ে খুঁজছিল ওরা অনিলকে, এরই জন্যে প্রাণ দিতে হলো জুলি মাযিনিকে, হয়তো এরই জন্যে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে অনিল- এরই জন্যে এতসব। কি আছে এর ভেতর? এমন কিছু আছে, যাতে নির্দোষ প্রমাণ করা

যাবে অনিলকে?

একটা সিগারেট ধরিয়ে নীল প্লাস্টিকের মোড়ক খুলল রানা। তিন ইঞ্চি লম্বা, দুই ইঞ্চি চওড়া ছোট একটা নোট বুক। কাভারটা লাল। নোট বুকের গায়ে রবার ব্যাণ্ড দিয়ে আটকানো একটা চিঠি। ব্যাণ্ডটা খুলে চিঠির সম্ভাষণটা পড়ে অবাক হয়ে গেল রানা। ওকেই লেখা চিঠি। তিনটে শীট উল্টে লেখকের নাম পড়ল রানা। অনিল লিখেছে।

নোট বইটার পাতা উল্টাল রানা। প্রথম দু'তিনটি পৃষ্ঠায় কি যেন লেখা আছে দুর্বোধ্য কোডে। বাকি সব পৃষ্ঠা খালি। চেষ্টা করলেও যে আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই কোড ভেঙে অর্থ উদ্ধার করতে পারবে এমন ভরসা পেল না রানা। কাজেই চিঠির প্রতিই মনোনিবেশ করল সে।

প্রিয় মাসুদ রানা,

এ চিঠি যখন তোমার হাতে পৌঁছবে, যদি পৌঁছায়, তখন খুব সম্ভব আমি আর এই পৃথিবীতে নেই। একটা পোড়ো বাড়িতে ক্যাম্প-খাটে শুয়ে লিখছি তোমাকে এ চিঠি। কাঁধে গুলি খেয়েছি, গুলিটা রয়ে গেছে ভেতরে। দিন দিন অবস্থা খারাপের দিকে চলেছে। ডাক্তারের সাহায্য নেয়া যাচ্ছে না, ডাক্তার ডাকলেই ধরা পড়ে যাব। ধরা পড়া মানেই মৃত্যু।

লাল নোট বইটায় ভারতের জন্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য আছে। লা কোসা নোস্ট্রার ড্রাগস ডিপার্টমেন্ট থেকে চুরি করেছি ওটা আমি। টের পেয়ে গেছে এই ডিপার্টমেন্টের চীফ সিলভিও পিয়েত্রো। লেগে গেছে আমার পিছনে। আমি জানি এই ভয়ঙ্কর লোকটার হাত থেকে নিস্তার নেই আমার, আহত অবস্থায় কিছুতেই বেরোতে পারব না ইটালী থেকে। রোম থেকে তেড়ে নিয়ে এসেছে এরা আমাকে ভেনিস পর্যন্ত। বুঝতে পারছি, জাল

গুটিয়ে আনছে এখন, ধরা পড়তে আমার আর বেশি দেরি নেই। শেষ চেষ্টা হিসেবে তোমার উপর ভার দিয়ে যাচ্ছি আমি- যেমন করে পারো, এ নোট বইটা পৌঁছে দেবে আমার চীফ শ্রীরঞ্জন চৌধুরীর হাতে। রানা, যেমন করে পারো। তারপর যদি সময় করতে পারো, তাহলে আমার মাকে একটু আমার কথা বলো, সান্ত্বনা দিয়ো। ওঁকে ধারণা দেয়া হয়েছে, আমি দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক। তুমি বলো, আমি তা ছিলাম না।

এই বইটা হাতাবার জন্যে আমাকে সেই রকমই ভান করতে হয়েছিল, মিশে যেতে হয়েছিল এদের সাথে। ব্যাপারটা জানেন শুধু আমার চীফ আর আমি, আর এখন জানলে তুমি। আর কাউকে জানানো হয়নি। কাউকে না। আর সবাই জানে, আমি আনুগত্য বদলে ফেলেছি টাকার লোভে। গোপনীয়তা রক্ষা এতই জরুরী ছিল যে আমার মাকে পর্যন্ত ভুল ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে আমার বিরুদ্ধে। এটা দরকার ছিল। আমার নিরাপত্তার জন্যেই প্রয়োজন ছিল এর। কারণ আমার দেশেও লোক আছে এদের।

এ বইটার ব্যাপারে যাই করো, সাদামাঠা কিছু করতে যেয়ো না। ভারতীয় কনসুলেট বা এমব্যাসিতে যেয়ো না। পোস্টে পাঠাবার চেষ্টা কোরো না। রঞ্জন চৌধুরীর হাতে দিতে হবে তোমার বইটা নিজ হাতে। আর কারও হাতে নয়। সর্বত্র এজেন্ট আছে এদের। ভয়ানক ক্ষমতাশালী এরা। কাউকে বিশ্বাস কোরো না। সিলভিও পিয়েত্রো যদি জানতে পারে তোমার কাছে রয়েছে নোট বইটা, তোমাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে দ্বিধা করবে না এক সেকেণ্ড। এদের আণ্ডার-এস্টিমেট কোরো না। দারুণ অসুবিধেয় পড়বে তুমি ইটালী থেকে বাইরে বেরোতে গিয়ে। ইচ্ছে করলে সব পথ বন্ধ করে দিতে পারে সিলভিও। ইউরোপের কোথাও তুমি নিরাপদ নও। ইংল্যাণ্ড অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, কিন্তু সেখান পর্যন্ত ধাওয়া করতে পারে এরা। যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা আমার

চীফের হাতে তুলে দাও, ততক্ষণ পর্যন্ত কোথাও তোমার নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নেই।

সব সময় মনে রাখবে, সারা ইউরোপে ওদের লোক আছে, প্রত্যেক দেশে রয়েছে নেট-ওঅর্ক। যমের মত ভয় করে এদের সবাই। বহু সরকারী কর্মচারী কাজ করছে এদের হয়ে- পুলিস, কাস্টম্‌স্‌, এমনকি আর্মিতে পর্যন্ত আছে এদের লোক। এয়ারপোর্টে লোক আছে, হোটেলে লোক আছে, সবখানে। এমন কি প্রয়োজন হলে পেট্রলপাম্প ওয়ালাদের নির্দেশ দেয়া হবে তোমার গাড়ি অকেজো করে দেয়ার জন্যে, হুকুম পেলে প্লেন পর্যন্ত ক্র্যাশ করা হবে, গ্রেপ্তার করা হবে তোমাকে ট্রেন থেকে যে-কোন একটা আজেবাজে ছুতোয়। সহজে নিস্তার নেই তোমার। আমার একমাত্র ভরসা, সহজ লোক তুমি নও।

তোমাকে এত কথা বলার উদ্দেশ্য ভয় দেখানো নয়, সাবধান করে দেয়া। খুবই সতর্কতার সাথে কাজ করতে হবে তোমাকে। ভুলেও আণ্ডার-এস্টিমেট করবে না এদের।

তোমার উপর এই বিপজ্জনক গুরুদায়িত্ব চাপাতে হচ্ছে বলে আমি খুবই দুঃখিত। কিন্তু এছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। নিজের কথা ততটা ভাবছি না যতটা ভাবছি দেশের কথা। আমার দেশের স্বার্থে তোমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার কথাটাও ভাবছি না, এটাকে স্বার্থপরতা বলা যায়, দুর্বল অক্ষমের এ স্বার্থপরতাটুকু ক্ষমা করে দিয়ো। আমার পক্ষে সম্ভব হলে আমি নিজেই করতাম কাজটা।

ডাক না আসা পর্যন্ত আনন্দে থাক- এই শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি।

অনিল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

চিঠিটা অন্যমনস্কভাবে ভাঁজ করে বুক-পকেটে রেখে দিল রানা।

দ্রুত চিন্তা চলছে ওর মনের মধ্যে। ঘড়ি দেখল। ঘণ্টাখানেক পর ওডিড কি করছে ভেবে ব্যস্ত হয়ে উঠবে সিলভিও। তার আগেই ব্যবস্থা করতে হবে যা করার। এখনি সবকিছু ওরা জেনে ফেলেছে কিনা কে জানে। যত দ্রুত সম্ভব এদের চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে ভেনিস থেকে।

চায়ের কাপ হাতে করে ঢুকল গিলটি মিয়া।

সংক্ষেপে বলল রানা সব ব্যাপার। শুনে ভ্রূ কুঁচকে গেল গিলটি মিয়ার।

চায়ের কাপ শেষ করে দুটো টান দিয়ে অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল রানা সিগারেটটা। কানে তুলে নিল টেলিফোন রিসিভার। ডায়াল করল লিডো এয়ারপোর্টে।

এয়ার-ট্যাক্সি চালক মেথিসের সাথে বেশ খাতির হয়ে গিয়েছিল ওর লিডো থেকে দুপুরে পডুয়া যাওয়ার পথে। ওকেই চাইল রানা।

'আপনি একটু ধরুন। আচ্ছা, হ্যালো, কে বলছেন আপনি?'

'বলুন মাসুদ রানা। জরুরী দরকার।'

কয়েক সেকেণ্ড বিরতি। তারপর সেই একই কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'দুঃখিত। সিনর মেথিস এখানে নেই।'

'কোথায় আছে?'

'আমি ঠিক জানি না, সিনর।'

'ওর তো এই সময় থাকার কথা? যাই হোক, আমার একটা এয়ার-ট্যাক্সি দরকার। এক্ষুণি। লিডো টু প্যারিস। চার্টার করতে চাই। ব্যবস্থা হয়ে যাবে?'

'দাঁড়ান, একটু দেখে বলছি।'

অসহিষ্ণুভাবে অপেক্ষা করল রানা আধ মিনিট, খড়মড় আওয়াজ হলো, ভেসে এল কণ্ঠস্বর।

'আমি দুঃখিত। আগামীকাল দুপুরের আগে কোন প্রাইভেট চার্টার প্লেনের ব্যবস্থা করা যাবে না, সিনর।'

'খরচ যাই হোক কিছু এসে যায় না। আজ রাতেই আমার প্যারিস যাওয়া দরকার।'

'সেটা সম্ভব নয়, সিনর। কাল দুপুরের আগে হবে না।'

'এয়ারপোর্ট ম্যানেজারের কানেকশন দিন। তার সাথে কথা বলতে চাই আমি।'

'উনি বাসায় চলে গেছেন, সিনর,' একঘেয়ে কণ্ঠে বলল লোকটা।

'বাসার নাম্বারটা দিন।' হাল ছাড়ল না রানা।

'বাসার নাম্বার আমার জানা নেই, সিনর। দুঃখিত।'

ভ্রূ জোড়া কুঁচকে গেছে রানার, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে চোখের দৃষ্টি। পরিষ্কার বুঝতে পারল ব্যাপারটা। কোনরকম সহযোগিতা আশা করা যায় না এখান থেকে। অনর্থক সময় নষ্ট হবে, লাভ হবে না চেষ্টা করে। সত্যিই প্লেন নেই, নাকি ইতিমধ্যেই কাজে নেমে গেছে সিলভিও? এতই দ্রুত! এখন একমাত্র ভরসা পাগলা ওস্তাদ।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে গিলটি মিয়ার দিকে ফিরল রানা।

'প্লেন চার্টার করা গেল না। তুমি বরং থেকে যাও, গিলটি মিয়া। এদিকের অবস্থাটা শান্ত দেখলে কাল-পরশু অ্যালিটালিয়ার একটা টিকেট কেটে পৌঁছে দেবে তোমাকে বাতিস্তা লিডো এয়ারপোর্টে।'

'আর আপনি?' শান্ত গলায় প্রশ্ন করল গিলটি মিয়া।

'আমি মোটরবোটে করে চলে যাব ভেনিস থেকে ওদের চোখে ধুলো দিয়ে। টেস্নে বা গাড়িতে যাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। এয়ার-ট্যাক্সি চার্টার করা যাচ্ছে না। বোটে করে যতদূর যাওয়া যায় গিয়ে তারপর ধরব হাঁটা পথ।'

'সে তো খুব ভাল কতা। আমাকে সাতে নিতে অসুবিদে কি?'

'খুবই কষ্ট হবে, তাছাড়া বিপদও আছে এই লম্বা জার্নিতে। প্রতিপক্ষ খুবই শক্তিশালী, যাতে এদেশ থেকে বেরোতে না পারি সে চেষ্টার কোনরকম ত্রুটি করবে না। সর্বশক্তি নিয়োগ করবে ঠেকাবার জন্যে। কাজেই...'

'কাজেই ওরা আপনাকে তেড়ে ধরে খুন করুক আর ইদিকে আমি ঠ্যাংয়ের ওপর ঠ্যাং তুলে গোঁপে তা দিয়ে বসে থাকি, নিচ্চিন্ত, নিজঝঢ়াট। সেটি হচ্চে না। আমিও যাচ্চি আপনার সাতে। বেশি গ্যাঞ্জাম করলে নুকিয়ে পিচু নেব বলে রাকচি আগে থেকে।'

গিলটি মিয়ার চোখ পাকানো দেখে হেসে ফেলল রানা।

'ঠিক আছে, যদি যেতে চাও, তৈরি হয়ে নাও পাঁচ মিনিটের মধ্যে। জামা-কাপড় এতেই চলবে, শুধু দুটো রাকস্যাকে পাঁচ-সাত দিন টেকার মত খাবার ভরে নাও। বিনকিউলারটা নিতে ভুলো না। এক বোতল ব্র্যাণ্ডিও নিয়ো। যাও, কুইক।'

'দু'মিলিট, স্যার। আসচি। মালপত্রগুনো?'

'ওগুলো থাকবে। এর ব্যবস্থা করা যাবে পরে। ভাল কথা, তোমার ঘরে টেবিলের ড্রয়ারে গোটাকয়েক ম্যাপ দেখেছিলাম, ওগুলো নিয়ে নিয়ো সাথে। কাজে লাগবে।'

'ঠিক আচে।'

দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল গিলটি মিয়া। লম্বা জার্নির উপযোগী কাপড় পরে নিল রানা। প্যান্টের একটা গুপ্ত পকেটে রাখল নোট বইটা নীল প্লাস্টিক মুড়ে। অনিলের সততায় আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই- যথাসাধ্য সাহায্য করবে সে ওকে। সবচেয়ে বড় কথা এখন অনিলেরই খাতিরে ভেনিস থেকে ওদের মনোযোগ অন্যত্র সরানো দরকার। কাজেই একেবারে হাওয়া হয়ে গেলে চলবে না, পিছু ধাওয়া করবার জন্যে কিছু কিছু সূত্র রেখে যেতে

হবে পিছনে।

এখন প্রথম কাজ সারাগাত হোটেল থেকে ওর পিস্তল আর টাকা নেয়া, তারপর সোজা ওস্তাদ স্টেফানো মন্টিনির বাসা। মোটরবোটটা একবার ছাড়তে পারলে আর ওকে পায় কে।

ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজা।

থমকে দাঁড়াল রানা চৌকাঠের উপর। সারাটা মেঝে লাল হয়ে আছে তাজা রক্ত লেগে। সারা ঘর লণ্ডভণ্ড।

কোসা নোসটস্পা! ভয়ঙ্কর মাফিয়ার আর এক নাম- কোসা নোসট্রা! বিদ্যুৎগতি এদের কাজে।

হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে পড়ে আছে ওস্তাদ রক্তাক্ত মেঝের উপর। ফাঁক হয়ে আছে গলাটা বিকট ভঙ্গিতে।

জবাই করা হয়েছে পাগলা ওস্তাদকে।

পাঁচ

'কিছুই করতে পারলাম না, সিনর!' অবিরাম কাঁদছে বাতিস্তা, ফোঁপাচ্ছে। দরদর জল গড়াচ্ছে দু'চোখ বেয়ে। 'ওরা প্রতিশোধ নিয়ে গেছে ওড্ডির মৃত্যুর। আমি যখন এসে পৌঁছলাম, তখন সব শেষ।'

'আক্ষেপ করে কোন লাভ নেই, বাতিস্তা।' ওর কাঁধের উপর হাত রাখল রানা। 'আমাদের করবার কিছুই ছিল না। এখনও নেই। তুমি বাসায় চলে যাও। কি করতে হবে পরে একসময় জানাব আমি তোমাকে।'

'আর আপনি? আপনি কি করবেন এখন?'

'এখনও ঠিক করতে পারিনি কি করব। অনেকটা ভরসা করেছিলাম ওস্তাদের জোগাড় করা মোটরবোটের ওপর। এখন কি করা যায় ভেবে বের করতে হবে আবার। বদলে নিতে হবে প্ল্যানটা।'

'কেন? মোটরবোটের চাবি তো আমার সামনে ওস্তাদকে দিয়ে দিয়েছে সিনর ম্যারিয়ানো। আপনাকে দেয়নি সেটা ওস্তাদ?'

'না। হয়তো ভুলে গেছে।'

'তাহলে নিশ্চয়ই ওটা ওঁর পকেটেই আছে,' বলতে বলতে ঘরে ঢুকে পড়ল বাতিস্তা। জ্যাকেটের ভিতরের পকেট থেকে বের করে আনল দুটো চাবি পরানো একটা সুদৃশ্য রিঙ। ফিরে এসে রানার হাতে দিল ওটা। 'চলুন, আমি চিনি বোটটা। দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাকে।'

'ভেরি গুড!' বলল রানা। 'তাহলে আর প্ল্যান বদলানোর কোন দরকার নেই। চলো, পথে বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাকে তোমার পরবর্তী কাজটা।'

দশ মিনিট অনর্গল কথা বলল রানা। চুপচাপ শুনল বাতিস্তা হাঁটতে হাঁটতে।

সব শুনে বাতিস্তা বলল, 'কাজটা আপনার জন্যে খুবই বিপজ্জনক হয়ে যাচ্ছে।'

'কিন্তু এছাড়া ভেনিস থেকে ওদের নজর অন্যদিকে ফেরাবার আর কোন উপায় নেই।'

'তা ঠিক,' চিন্তিত মুখে বলল বাতিস্তা। 'কিন্তু আমাকে সাথে নিলে আপনার অনেক সুবিধে হত।'

'হত। কিন্তু তুমি ভেনিসে থেকে যে উপকার করতে পারবে, আমার সাথে গেলে সেটা পারবে না।'

মাথা ঝাঁকাল বাতিস্তা। বুঝতে পেরেছে। 'ঠিক আছে। অনুকূল পরিবেশ দেখলেই প্লেনে তুলে দেব আমি ওকে।'

আঙুল তুলে দেখাল বাতিস্তা বোটটা। খুশি হয়ে উঠল রানা মনে মনে। ঝকঝকে চেহারার একটা বত্রিশ ফুট লম্বা কেবিন-ক্রুসেট। রানা জানে, খুবই শক্তিশালী এঞ্জিন থাকে এসব কেবিন-ক্রুসেটে। ট্যাংক দুটো এখন ভরা থাকলেই হয়।

যা ভয় পেয়েছিল, তাই। একটা ট্যাংক একেবারে খালি, অপরটায় অর্ধেক আছে তেল।

'কোন চিন্তা নেই,' বলল বাতিস্তা। 'একটু এগোলেই মোটরবোটের ডিজেল-পাম্প। চলুন, তেল ভরা হলে নেমে যাব আমি।'

তেলের কথা শুনেই চোখ কপালে তুলল পাম্পওয়ালা।

'এত রাতে ডিজেল দেয়া যাবে না। পাম্প বন্ধ।'

'ডবল পয়সা দেব। একটু কষ্ট করতেই হবে আমাদের জন্যে, সিনর। আমাদের খুবই জরুরী দরকার।' পকেট থেকে বেশ কয়েকটা পাঁচ হাজার লীরার নোট বের করে লোকটার নাকের সামনে দিয়ে ঘুরিয়ে আনল রানা।

লোভে চকচক করে উঠল লোকটার চোখ জোড়া টাকা দেখে, কিন্তু নিভে গেল আলোটা খুব অল্পক্ষণেই। মাথা নাড়ল সে। 'আমি খুবই দুঃখিত, সিনর। আপনাকে সাহায্য করতে পারলে আমি খুশি হতাম। কিন্তু আসলে তেলই নেই আমার কাছে। আগামীকাল নতুন কনসাইনমেন্ট আসবে, তখন আপনাকে তেল দিতে কোন অসুবিধেই থাকবে না আর।'

রানা বুঝল, মিথ্যে কথা বলছে লোকটা। পাম্পটা দশ সেকেণ্ড পরীক্ষা করেই বুঝতে পারল ডিজেলের অভাব নেই ট্যাংকে। মৃদু ইশারা করল বাতিস্তাকে। এক লাফে লোকটার পিছনে চলে এল বাতিস্তা, পিছন থেকে পেঁচিয়ে ধরল গলা।

'খবরদার!' লোকটার কানের কাছে ফিস ফিস করে বলল বাতিস্তা, 'টুঁ শব্দ করলে মটকে দেব ঘাড়।'

লোকটার পকেট থেকে চাবি নিয়ে পাম্প চালু করল রানা। ট্যাংক দুটো পুরো ভরে নিয়ে এসে দাঁড়াল লোকটার সামনে। ফেরত দিল চাবি। চার-পাঁচটা পাঁচ হাজার লিরার নোট ঢুকিয়ে দিল লোকটার বুক পকেটে। হাসল।

'মিথ্যে কথা কেন বলছিলে?'

কোন উত্তর নেই। গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা নাক মুখ কুঁচকে। আশঙ্কা করছে এই বুঝি ধাঁই করে ঘুসি পড়বে ওর নাকের ওপর। মারল না রানা। আরও দুটো নোট গুঁজে দিল ওর পকেটে। পিস্তল বের করল।

'একে ছেড়ে দিয়ে বাসায় চলে যাও তুমি,' বাতিস্তাকে বলল রানা। 'কোথায় কোথায় খোঁজ নিতে হবে তা তো জানাই আছে তোমার। লাইন পরিষ্কার দেখলে বাকি কাজটুকু সেরে ফেলবে। গুডবাই।' লোকটাকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে বাতিস্তা এক পা দু'পা করে। বেশ কিছুদূর সরে যেতেই উঠে পড়ল রানা মোটরবোটে। পিস্তলটা পকেটে পুরে বলল, 'নেমকহারামী কোরো না। ফলটা তোমার জন্যেই খারাপ হবে।'

ছোট্ট একটা গর্জন করেই চালু হয়ে গেল এঞ্জিন। ধীরে ধীরে এগোল বোটটা, আর একটু গেলে পড়বে বড় খালে, তারপর বাড়বে স্পীড। চিওগিয়ার দিকে যাবে প্রথমে, সোজা দক্ষিণে, তারপর পো নদী বেয়ে চলে যাবে মিলানো পর্যন্ত; সেখান থেকে চেষ্টা করবে প্লেন ধরবার। রানা আশা করেছিল, টেস্ন, প্লেন, বাস বা গাড়িতে করে যাতে ও ভেনিস থেকে বেরোতে না পারে সে ব্যবস্থা করেই সন্তুষ্ট হবে সিলভিও, ও যে এত অল্প সময়ে বোট সংগ্রহ করে ফেলতে পারবে সেটা কল্পনাও করতে পারবে না। কিন্তু পাম্পওয়ালার ব্যবহার দেখে ভিতরে ভিতরে চমকে গেছে ও। প্রথমে এয়ারপোর্টের অসহযোগিতা, তারপর এই ডিজেল-অসহযোগ- নাহ্, দৈব-সংযোগ হতেই পারে না। অত্যন্ত

ক্ষমতাশালী কোন ব্যক্তির আদেশ আছে এদের উপর। রানার নাম ও চেহারার বর্ণনা দেয়া আছে এদের কাছে। রানা কি ভাবে ভেনিস থেকে বেরিয়েছে সে খবর সিলভিওর কানে পৌঁছতে দেরি হবে না। কাজেই মিনিটে মিনিটে প্ল্যান পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে। গোড়াতেই গলদ রয়ে গেল, কিন্তু ডিজেল ছিনিয়ে না নিয়ে আর কোন উপায় ছিল না ওর।

হঠাৎ ধুপধাপ পায়ের শব্দে চমকে ডানদিকে ফিরল রানা ও গিলটি মিয়া।

'ঘাপলা বেধে গেচে, স্যার,' বলল গিলটি মিয়া। 'পুলিস!'

চারজন সেপাই এসে দাঁড়িয়েছে পারে। সশস্ত্র।

'এই যে, সিনর!' চিৎকার করে উঠল ওদের একজন। 'মোটরবোট ভিড়াও তীরে।'

'থামাতে বলচে, স্যার। থামাবেন?' জিজ্ঞেস করল গিলটি মিয়া।

'দাঁড়াও, দেখি।' গতিটা একটু মন্থর করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। পারে দাঁড়ানো সিপাইগুলোর কাছাকাছি এসে গেছে ওরা এখন। চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?'

'থামাও বোট! পারে নিয়ে এসো।' বোটের সাথে হাঁটতে শুরু করেছে ওরা।

'কেন? কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

বড় খালের একেবারে কাছে চলে এসেছে ওরা।

'কি হয়েছে ভাল করেই জানা আছে তোমার!' ধমকে উঠল একজন পার থেকে। 'পাম্প থেকে ডিজেল চুরি করেছ তোমরা এক্ষুণি। থামাও বোট!'

সবই বুঝল রানা। এখন বোট থামানো মানে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়া, তারপর চলবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন, কৈফিয়তের পর কৈফিয়ত। ওস্তাদের খুনের সাথে ব্যাপারটা জড়িয়ে ফেললে তো

আর কথাই নেই। অন্তত দশ দিনের জন্যে আটকে যাবে সে ভেনিসে।

'কি হলো? থামাচ্ছ না?' রেগে উঠল একজন কর্কশ কণ্ঠধারী।

'একটু তাড়া আছে, দাদা,' বলল রানা। 'আরেকদিন গল্প করা যাবে, আজ আসি।'

থ্রটল খুলে দিল রানা অর্ধেকটা। প্রায় লাফিয়ে এগোল কেবিন ক্রুসেট। মোড় নিল বাঁয়ে।

'গুলি করবে সন্দো হচ্ছে, স্যার!' বলল গিলটি মিয়া। 'বন্দুক নামাচ্চে কাঁধ থেকে।'

'শুয়ে পড়ো,' বলল রানা। নিজেও নিচু করল মাথাটা।

বড় খালে এসে গেছে বোট। থ্রটল পুরো খুলে দিল রানা। দ্বিগুণ হয়ে গেল এঞ্জিনের গর্জন, সামনের দিকটা পানি থেকে একহাত উপরে উঠে গেল। ফুল-স্পীডে বাঁক নিয়ে আড়াল হয়ে গেল পারে দাঁড়ানো সেপাইদের রাইফেলের মুখ থেকে।

সোজা হয়ে বসল রানা। সিগারেট ধরাল।

লিডো পেরিয়ে পেলেস্ট্রিনার দিকে চলেছে কেবিন-ক্রুসেট অন্ধকার ভেদ করে। কোথাও বাতির কোন চিহ্ন নেই। আকাশে হালকা এক পরতা মেঘ থাকায় আধ-খাওয়া চাঁদটা ম্লান ভূতুড়ে আলো ফেলছে অ্যাড্রিয়াটিক সাগরের বিষণ্ণ ঢেউয়ের মাথায়।

শুয়ে শুয়ে কুঁই কুঁই করে করে বাংলাদেশের একটা জনপ্রিয় পল্লীগীতি গাইছে গিলটি মিয়া।...তোমরা সুখে রইলা। কোন দূরে যাও চইলা। নাইয়ারে, নায়ে বাদাম তুইলা...। হু-হু বাতাসে ডুকরে কেঁদে উঠতে চায় মনটা অচেনা, অজানা এক গ্রাম্যবধূর দুঃখে।

শক্তিশালী একটা শর্ট-ওয়েভ রেডিয়ো রিসিভারের টিউনিং নব

ঘুরাচ্ছিল রানা, কানে হেডফোন। বিরক্ত ভঙ্গিতে খুলে ফেলল সে হেডফোনটা, অফ করে দিল রেডিয়ো।

'নাহ্! আর পারা গেল না!'

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল গিলটি মিয়া।

'কি হলো আবার?'

'এই বোটে করে আর বেশিদূর যাওয়া নিরাপদ নয়,' বলল রানা। 'পেসারো পর্যন্ত যত কোস্টাল-টাউন আছে সব জায়গার পুলিসকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে। দুটো মোটরবোট নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে চিওগিয়া পুলিস। খুঁজছে আমাদের।'

'অন্যায়টা কি করলাম আমরা, স্যার? আমাদের বিরুদ্দে কি প্রমাণ...'

'কথা তো সেটা নয়,' বলল রানা। 'যেমন করে হোক আমাদের ঠেকানো দরকার। ঠেকাতে পারলে নোট-বইটা কেড়ে নেয়া এমন কিছু কঠিন হবে না ওদের পক্ষে। দারুণ সুবিধে হয়েছে সিলভিওর আমরা ডিজেল চুরি করতে বাধ্য হওয়ায়। এখন পুরো ইটালিয়ান পুলিস ফোর্স ব্লাড-হাউণ্ডের মত লেগে গেছে আমাদের পেছনে। হন্যে হয়ে খুঁজবে ওরা আগামী কয়েকদিন। সিলভিওকে আর কষ্ট করতে হবে না, পুলিসই কষ্ট করছে ওর হয়ে। কী মজা!' সিগারেট ধরাল রানা। 'দিনের বেলা এক মাইল দূর থেকে যে কেউ একবার তাকালেই চিনতে পারবে এই বোট। এর চেহারার বর্ণনা দিয়ে আকাশ-বাতাস গরম করে তুলেছে ব্যাটারা। টিস্সটির দিকে পালাব তারও উপায় দেখছি না। পো নদী ধরে যে মিলানো পর্যন্ত পৌঁছতে পারব, মনে হয় না, ধরা পড়ে যাব আগেই। কাজেই ওই দুটো মোটরবোটের খপ্পরে পড়বার আগেই তীরে পৌঁছোনো দরকার আমাদের। মোটরবোট ছেড়ে দিয়ে পায়ে হেঁটে পড়ুয়া পৌঁছবার চেষ্টা করতে হবে আমাদের। আমাদের চেহারা দেখতে পায়নি পুলিস, কাজেই

এদিক দিয়ে চেষ্টা করলে ওদের আঙুল গলে বেরিয়ে যাওয়া অসম্ভব নাও হতে পারে।'

'ওরেব্বাপ! হাঁটতে হাঁটতে ক্ষয়ে যাবে পা। পড়ুয়ায় পৌঁচতে পৌঁচতে দেখব আরও ছ'ইঞ্চি বেঁটে হয়ে গেচি!'

কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করল রানা চিওগিয়া পৌঁছে পারে নামবে না এখুনি নামবে। সিদ্ধান্ত নিয়ে বাঁক নিল সে। হঠাৎ কথা বলে উঠল গিলটি মিয়া। কান পেতে কি যেন শুনবার চেষ্টা করছে সে।

'একটা ধুকপুক এঞ্জিনের শব্দ যেন শুনতে পেলুম, স্যার।'

'কতদূরে?' বলেই থ্রটল বন্ধ করে দিল রানা।

গিলটি মিয়াকে আর উত্তর দিতে হলো না। পরিষ্কার শুনতে পেল রানা মোটরবোটের এঞ্জিনের শব্দ। ডানদিক থেকে। এগিয়ে আসছে এইদিকে। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না কিছুই। ধীরে ধীরে থেমে এল কেবিন ক্রুসেট। সিগারেটটা সাবধানে নিভিয়ে ফেলল রানা।

'একটা চান্স্ নিয়ে দেখা যাক,' বলল রানা। 'অন্ধকারে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারে।'

চুপচাপ বসে রইল ওরা। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এঞ্জিনের শব্দটা জোর হচ্ছে ক্রমেই।

'মনে হচ্চে অন্ধকারে আমাদের ঘাড়েই এসে পড়বে শালারা।'

সামান্য একটু থ্রটল দিয়ে খানিকটা বাঁয়ে সরিয়ে নিল রানা বোটটা। প্রায় নিঃশব্দে সরে গেল ওরা বেশ খানিকটা।

এগিয়ে আসছে পুলিসের বোট। এঞ্জিনের শব্দ বেড়ে গেছে এখন কয়েকগুণ। অনেক কাছে এসে পড়েছে। এমনি সময় দপ করে জ্বলে উঠল সার্চলাইট। তীব্র উজ্জ্বল সাদা আলো দিন করে ফেলল রাতকে।

'পুলিসের বোট!' চাপা কণ্ঠে বলল রানা। পুরো থ্রটল খুলে

দিল সে। 'ভাগলাম জান-প্রাণ নিয়ে।'

সার্চলাইটটা ঘুরে এসে স্থির হলো কেবিন-ক্রুসেটের উপর। ততক্ষণে ওটার নাক উঠে পড়েছে পানি ছেড়ে হাতখানেক উপরে। খোলা সমুদ্রের দিকে ছুটেছে প্রাণপণে।

'ধরে ফেলচে, স্যার!' ভীত গিলটি মিয়ার কণ্ঠস্বর। 'এগিয়ে আসচে। পারচি না আমরা!'

প্রথম এক মিনিট কমে এল দূরত্ব, তারপর কয়েক সেকেণ্ড সমান থাকল, তারপর বাড়তে শুরু করল।

'নিচু হয়ে থাকো, গিলটি মিয়া! চেহারা যেন দেখতে না পায়। মাইল দশেক ঘুরে আমরা আবার ফিরে আসব পারে।'

'দুটো বোট খুঁজচে আমাদের। তা আরাকটা কই?'

'চারদিকে চোখ রাখো। এর হাত থেকে বেরিয়ে আবার ওটার খপ্পরে না পড়ি। সাবধান, গিলটি মিয়া, গুলি করছে ওরা!'

ছোট্ট একটা আগুনের স্ফুলিঙ্গ দেখতে পেয়েছে রানা। পরমুহূর্তে কড়াৎ করে আওয়াজ হলো। মৃদু গুঞ্জন তুলে মাথার উপর দিয়ে চলে গেল পাঁচ পাউণ্ডের গোলা।

উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছে সার্চলাইটের আলো। বেশ অনেকটা দূরে সরে গেছে কেবিন-ক্রুসেট। দ্রুত সরে যাচ্ছে আরও দূরে। দ্বিতীয় গোলাটা পানিতে পড়ল দশ হাত ডাইনে। আধ মিনিটের মধ্যে আরও একটা স্ফুলিঙ্গ দেখা গেল। শব্দটা পৌঁছতে আরও একটু দেরি হলো। কিন্তু গুলিটা পৌঁছল ঠিক ঠিক। ছাতের খানিকটা অংশ মড়মড় করে ভেঙে দিয়ে বেরিয়ে গেল সেটা, ভাঙা কাঠের টুকরো-টাকরা পড়ল রানার আশেপাশে। গতিপথ সামান্য একটু পরিবর্তন করল রানা। নতুন গতিপথে বাতাসের বাধা কমে যাওয়ায় আরও জোরে ছুটল কেবিন-ক্রুসেট। সার্চলাইটের আওতার বাইরে চলে এসেছে ওরা এখন।

নিভে গেল সার্চলাইট। ডাইনে মোড় নিল রানা এবার। পুলিস

বোটের দুটো লাল বাতি দেখা যাচ্ছে আধ মাইল দূরে। সোজা খোলা সমুদ্রের দিকে চলেছে ওটা।

'আপাতত ধুলো দেয়া গেছে ওদের চোখে,' বলল রানা। 'কিন্তু ফিরে আসবে ওরা আবার। তার আগেই নেমে পড়তে হবে আমাদের।'

'উই যে ওদের আরাকটা বোট!' বলল হঠাৎ গিলটি মিয়া।

পিছন ফিরে দেখল রানা, আবার জ্বলে উঠেছে সার্চলাইট। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় বোটটাকে। রানার ধোকাবাজি টের পেয়ে গেছে ওরা। তীরের দিকে আসবার জন্যে ঘুরছে অর্ধবৃত্তাকারে।

ঢেউয়ের মাথায় খুব বেশি রকম নাচানাচি শুরু করল বোটটা। রানা বুঝল, বেলাভূমি আর বেশি দূরে নেই। গতি কমিয়ে দিল।

'জোর একটা ধাক্কার জন্যে তৈরি থাকো গিলটি মিয়া। এসে গেছি।'

মিনিট তিনেক পর ভেজা বালির উপর দিয়ে দ্রুত পায়ে ছুটল ওরা সোজা পশ্চিম দিকে।

ছয়

পনেরো মিনিট দৌড়ে একটা সরু রাস্তায় পড়ল ওরা। আরও কিছুদূর এগিয়ে পড়ল বড় রাস্তায়। দ্রুত পায়ে হেঁটে চলেছে ওরা। কিছুদূর হেঁটে মুখ খুলল গিলটি মিয়া।

'সকাল হতে আর খুব বেশি দেরি নেই, স্যার। এই খোলামেলা জায়গায় দিনের বেলা চলা বোধায় ঠিক হবে না। বহুদূর থেকেও চেনা যাবে আমাদের।'

দু'পাশে এবড়ো-খেবড়ো মাঠ, খেত। সব সমতল। সত্যিই, আত্মগোপনের কোন উপায় নেই। রানা জানে, কেবিন-ক্রুসেট খালি দেখেই পুরো এলাকাটা সার্চের ব্যবস্থা করবে পুলিস। বিশেষ করে বড় বড় শহরে খুবই তৎপর থাকবে ওরা। কাজেই এখন গ্রামের কাছাকাছি থাকাই ভাল। হাঁটা পথে সরে যেতে হবে যতদূর পারা যায়। এবং সবার অলক্ষে।

'সবই নির্ভর করছে এখন আমাদের ধরার ব্যাপারে পুলিস কতটা আগ্রহী, তার ওপর,' বলল রানা। 'আমরা ভাবছি খুব বেশি কিছু অপরাধ করিনি আমরা। কিন্তু ওদের দৃষ্টিভঙ্গিটা আমাদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়া বিচিত্র নয়। ওরা হয়তো ভাবছে, ম্যারিয়ানোর কেবিন-ক্রুসেট চুরি করে, পিস্তল দেখিয়ে ডিজেল চুরি করে ভয়ঙ্কর দুই বিদেশী ডাকাত বেরিয়েছে ডাকাতি করতে। পুলিস থামতে বলেছিল, আদেশ অমান্য করেছি আমরা, এটাকেও ওরা হয়তো বিরাট করে দেখছে। কতখানি গুরুত্ব দিচ্ছে ওরা ব্যাপারটাকে সেটা বুঝতে না পারলে আমাদের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ হবে না। হয় বেশি ভয় পেয়ে অনর্থক সময় নষ্ট করব, নয়তো ধরা পড়ে যাব অসতর্ক অবস্থায়।'

'প্রথমটাই তো আমার কাছে ভাল মনে হচ্চে, স্যার। বেশি সাবদান হওয়াই ভাল। দেরি হয় হোক। কিন্তু রাতের বেলা তো হাঁটচি নিচ্চিন্ত মনে, দিনের বেলা কি করব?'

'আমিও সেই কথাই ভাবছি। দু'পাশে ফার্ম-হাউস খুঁজতে খুঁজতে যাব আমরা। দিনের বেলাটা লুকিয়ে থাকার মত কোন জায়গা পেয়ে যেতেও পারি। খড়ের গাদায়, গোয়াল ঘরে বা গুদাম ঘরে কোথাও না কোথাও জায়গা পেয়েই যাব।'

ঘণ্টা দেড়েক হাঁটার পর হঠাৎ কান খাড়া করল রানা।

'আমিও শুনতে পেয়েচি, স্যার!' বলল গিলটি মিয়া। রাস্তা ছেড়ে ঢাল বেয়ে পাশের খাদে নামতে শুরু করেছে সে।

রানাও নামল পিছু পিছু। পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ঢালের গায়ে শুয়ে পড়ল ওরা উপুড় হয়ে। একটা গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ এগিয়ে আসছে দ্রুত।

'মাটির গোন্দো সব দেশেই এক, তাই না, স্যার?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল গিলটি মিয়া।

ঝট করে ওর দিকে ফিরল রানা। 'হ্যাঁ। মানুষও এক। সব মানুষ এক।'

চলে গেল গাড়িটা। হেডলাইট নেভানো। শুধু সাইডলাইট জ্বলছে। পুলিসের টুপি চিনতে পারল রানা এক ঝলক দেখেই। সময় নষ্ট করেনি ওরা।

রাস্তায় উঠে এল রানা।

'মাটের মদ্যে দিয়ে হাঁটা ধরলে কেমন হয়, স্যার? রাস্তাটা বিশেষ নিরাপদ মনে হচ্চে না।'

'এবড়ো-খেবড়ো মাঠে খুবই কষ্ট হবে হাঁটতে, অথচ বেশিদূর এগোতে পারব না। চলো, যতদূর পারা যায় রাস্তা ধরে এগোই, তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।'

ভাঙা চাঁদের আলো বেশ কিছুটা জোরদার হয়েছে। আরও হালকা হয়ে যাচ্ছে মেঘ। মোলায়েম আলোর মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলল ওরা। ফুরফুরে ঠাণ্ডা বাতাস। প্রাণ জুড়িয়ে যায়। বিদেশী এক নির্জন রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে অতীতের অনেক কথা ভিড় করে আসতে চাইছে রানার মনে। অবচেতন মনের কোন্ গোপন মণিকোঠায় পড়ে ছিল হাজারো টুকরো কথা, স্মৃতি- ভেসে উঠছে সেসব মনের পর্দায়। মনে হচ্ছে স্বপ্নের ঘোরে আছে সে, হাঁটছে স্বপ্নে। পৃথিবীটা মায়াবী এক স্বপ্নের দেশ।

আরও আধ ঘণ্টা হাঁটার পর ফার্ম-হাউস পাওয়া গেল একটা। ঘড়ি দেখল রানা। সাড়ে চারটা। ভোর হতে দেরি নেই। এখানেই চেষ্টা করবে, না আরও সামনে গিয়ে আরেকটা ফার্ম-হাউস

খুঁজবে, সিদ্ধান্ত নেয়ার চেষ্টা করছিল রানা, এমনি সময় কথা বলে উঠল গিলটি মিয়া।

'চেষ্টা করে দেকতে ক্ষতি কি, স্যার? পরেরটা আবার কতদূর তার ঠিক আচে?'

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। রাস্তা থেকে শ দেড়েক গজ উত্তরে টালির ছাত দেয়া চুনকাম করা দোতলা বাড়ি। ইটালীর গৃহস্থ-বাড়ি। ঝকঝক করছে চাঁদের আলোয়। পাশেই গোলাঘর। তার পাশে গোয়াল।

'সাবধান করে দেয়া হয়েছে এদের,' বলল রানা। 'রাস্তার দু'পাশে যত ফার্ম-হাউস আছে প্রত্যেকের কাছে যাবে পুলিস। তবু চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি নেই। চলো। রাত থাকতে থাকতে একটা আশ্রয় খুঁজে নিতেই হবে।'

বড় রাস্তা ধরে একটা খোয়া বিছানো পথ গেছে ফার্ম-হাউস পর্যন্ত। কিন্তু সে পথে না গিয়ে মাঠ ভেঙে এগোল ওরা। একশো গজ নিশ্চিন্তে হেঁটে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল গিলটি মিয়া।

ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠেছে একটা কুকুর। কুকুর তো নয়, যেন বাঘের গর্জন।

'দেকা হয়েচে, স্যার! চলুন এবার!'

'হাউণ্ড!' আপন মনে বলল রানা। 'গুণ্ডাকে বশ করবার কায়দাটা কাজে লাগাব নাকি? এটার বেলায় খাটবে সেটা?'

গুণ্ডা হচ্ছে রানার পোষা ব্লাড-হাউণ্ডের বাচ্চা। কষ্ট করে ওটার সাথে খাতির করেছে সে। এখন দারুণ ভাব।

'কোন কিচ্চু খাটবে না, স্যার! চলুন, মানে মানে কেটে পড়ি। ওই দেকুন!'

বাতি জ্বলে উঠেছে দোতলার একটা ঘরে। দ্বিগুণ জোরে চিৎকার শুরু করেছে কুকুরটা, টেনে ছিঁড়ে ফেলবার উপক্রম করেছে চেন। মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল রানা।

'দৌড় দাও, গিলটি মিয়া। এসো আমার সাথে। ওরা মনে করবে কুকুরের ডাকে ভয় পেয়ে ভেগেছি আমরা।'

উল্টো দিকে দৌড়াতে যাচ্ছিল গিলটি মিয়া, রানাকে সোজা সামনের দিকে দৌড়াতে দেখে থমকে গেল এক সেকেণ্ড, তারপর পিছু নিল। এক ছুটে গোলাঘরের পিছনে এসে দাঁড়াল ওরা। ঘটাং করে দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেল ওরা পরিষ্কার।

দোতলা থেকে একটা মেয়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'হুট করে বেরিয়ে পড়ো না, বাবা। সাবধান! নেন্নি যাচ্ছে, একটু দাঁড়াও।'

'ওই হারামজাদা ছেলের জন্যে দাঁড়ালে সারারাত দাঁড়িয়ে থাকতে হবে আমার,' মোটা পুরুষ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'কুকুরটাকে বিরক্ত করছে জানি কোন শালা।'

'আমি আসছি, বাবা, একটু দাঁড়াও!' হারামজাদা ছেলের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

'দু'জন আসচে!' ভয়ে ভয়ে বলল গিলটি মিয়া।

'তিনজন,' বলল রানা। ঝনাৎ করে শব্দ হলো শিকলের। 'কুকুরটাকে ছেড়ে দিল ব্যাটা।'

'এই সেরেচে।' দেয়ালের সাথে সেঁটে পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল গিলটি মিয়া। 'সব্বো শরীল কাঁপচে স্যার। বুকের ভেতর...'

'চুপ!' চাপা গলায় ধমক দিল রানা। এগিয়ে গেল কয়েক পা। দশ সেকেণ্ডের মধ্যেই গোলাঘরটা ঘুরে চলে এল একটা বড়সড় হাউণ্ড। রানাকে দেখেই চাপা একটা গর্জন ছেড়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে এল ওর দিকে।

ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুকের ভিতরটা। কিন্তু নড়ল না একটুও। শেষ লাফটা দেয়ার আগে হঠাৎ থেমে দাঁড়াল হাউণ্ডটা। ইতস্তত করল কিছুক্ষণ, তারপর নাক নিচু করে শুঁকতে শুরু করল রানার চারপাশটা।

'এই তো লক্ষ্মী ছেলে!' বলল রানা। হালকা করে শিস দিল দাঁতের সাথে জিভ ঠেকিয়ে।

কাজ হলো এতে। কাছে সরে এল কুকুরটা। লেজ নাড়তে দেখেই নিচু হয়ে ওটার মাথায় আদর করল রানা। আদর পেয়ে একেবারে গলে গেল কুত্তার বাচ্চা, রানার গাল চেটে দেয়ার উপক্রম করল।

'বিউনো! এদিকে এসো!' চিৎকার শোনা গেল বুড়ো লোকটার।

আওয়াজ শুনে বোঝা গেল গোলাঘরের কাছাকাছি কোথাও রয়েছে লোকটা।

'যাও, বিউনো। ডাকছে!' মৃদুকণ্ঠে বলল রানা। ঠেলা দিল ওকে গোলাঘরের দিকে।

রানার মুখের দিকে চাইল হাউণ্ডটা, বুঝতে পারল কি বলতে চাইছে সে, এক ছুটে গোলাঘরটা ঘুরে অদৃশ্য হয়ে গেল। রানা ফিরল গিলটি মিয়ার দিকে। নেই!

অবাক হয়ে কয়েক পা এগিয়ে এল রানা। দেখল ইতিমধ্যেই একটা দরজা পেয়ে গোলাঘরের ভিতরে ঢুকে গেছে গিলটি মিয়া, দরজাটা সামান্য একটু ফাঁক করে দেখছে বাইরের অবস্থা। রানা কাছে যেতেই বিগলিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'এমনটি আর দেকিনি! একেবারে ভোজবাজী দেকিয়ে দিয়েচেন, স্যার!'

দরজাটা মেলে ধরল গিলটি মিয়া। ভিতরে ঢুকল রানা। দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই টর্চ বের করল পকেট থেকে। ঘরটা চট করে একবার দেখে মইয়ের দিকে এগোল রানা।

একগাদা খড় জড়ো করা আছে মাচার উপর। চারপাশে হাতখানেক জায়গা শুধু খালি রাখা আছে চলাফেরার জন্যে। গাদার উপর উঠে পড়ল গিলটি মিয়া। মচমচ শব্দ হলো। হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আরামের একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। সরু পথ বেয়ে

রানা চলে এল একটা দরজার কাছে, সামান্য ফাঁক করে চোখ রাখল সেই ফাঁকে।

কয়েক হাত নিচেই দাঁড়িয়ে আছে দু'জন লোক। একজনের হাতে একটা লণ্ঠন। কান খাড়া করে কি যেন শুনছে ওরা। কাৎ হয়ে আছে ঘাড়।

'খুব সম্ভব বিড়াল,' হারামজাদা পুত্র বলল পিতাকে। 'চলো বাবা, ঘুমিয়ে পড়বে। নইলে কাল আবার তোমার মেজাজের ঠেলায় জান বেরিয়ে যাবে সবার। বিউনোকে তো জানোই। কেউ থাকলে...'

গজগজ করে কি যেন বলল বুড়ো বোঝা গেল না। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে রওনা হলো বাড়ির দিকে।

'এটাকে ছেড়ে রেখে দাও আজ রাতে,' বুড়োর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। 'পুলিসকে খুশি করার জন্যে সারারাত জাগতে পারব না আমি। ওরা আমার কোন্ কাজে লেগেছে কবে?'

বোঝা গেল বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল দু'জনই। ঘটাং করে লেগে গেল বল্টু। খানিক বাদে দোতলার বাতি নিভে গেল।

উঠে পড়ল রানা খড়ের গাদায়।

'শুয়ে পড়েছে ওরা। খিদে লেগেছে? কিছু খেয়ে নেবে?'

'না, স্যার। একোন আর কিচু খাব না। ঘুম আসচে দু-চোক ভেঙে।'

'ঠিক আছে, ঘুমিয়ে পড়ো তাহলে। কাল সারাটা দিন বোধহয় এখানেই থাকতে হবে আমাদের। সন্ধের পর হাঁটা ধরব আবার।' চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল রানা। 'পডুয়া পেরিয়ে পাহাড়ী এলাকায় গিয়ে পড়তে পারলে দিনেও হাঁটা যাবে। তার আগে নয়।'

একটা সিগারেট ধরাবার ইচ্ছে দমন করল রানা। বেশ কিছুক্ষণ ঘুম এল না ওর চোখে। অতিরিক্ত ক্লান্ত হয়ে পড়লে ঘুম

আসতে চায় না সহজে। কম ধকল যায়নি গত কয়েকটা ঘণ্টা।

ভবিষ্যতের কথা ভাবল রানা কিছুক্ষণ। কত পথ চলতে হবে কে জানে। হন্যে হয়ে খুঁজছে ওদের পুলিস। সিলভিও যে চুপচাপ বসে নেই সেটাও সহজেই বোঝা যায়। একদিকে ইটালিয়ান পুলিস, অন্যদিকে ভয়ঙ্কর কোসা নোস্ট্রা- কিভাবে বেরোবে সে এদেশ থেকে? কোন্‌দিকে যাবে?

আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

চমকে জেগে উঠল রানা। ওর হাত ধরে নাড়া দিচ্ছে গিলটি মিয়া।

কয়েকটা ফুটো দিয়ে রোদ এসে পড়েছে অন্ধকার ঘরে, বেশ কিছুটা ফিকে হয়ে গেছে তার ফলে অন্ধকার। কয়েকজনের গলার আওয়াজ পেল রানা। খুব কাছেই।

'কি ব্যাপার?' চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল রানা।

'বাঁদা-কপি, স্যার!' ফিসফিস করে বলল গিলটি মিয়া। 'লরীতে তুলচে।'

সাবধানে কোন রকম শব্দ না করে উঠে পড়ল রানা। নিঃশব্দ পায়ে দরজার কাছে এসে চোখ রাখল ফাঁকে। দরজার ঠিক নিচেই দাঁড়িয়ে আছে একটা দশ-টনী ট্রাক। ত্রিপল দিয়ে অর্ধেকটা ঢাকা। ঝুড়ির পর ঝুড়ি সাজানো রয়েছে বাঁধা-কপি।

বাপ-বেটা কথা বলছে ড্রাইভারটার সাথে খোশমেজাজে।

খানিকক্ষণ কান পেতেই বুঝতে পারল রানা। পড়ুয়ায় চলেছে এই বাঁধা-কপির চালান। কথা বলতে বলতে চলে গেল ওরা বাড়ির দিকে। বোধহয় চা-নাস্তা খাওয়ানো হবে ড্রাইভার সাহেবকে।

মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিল রানা।

'চলো, গিলটি মিয়া! রওনা হওয়া যাক।'

ঝটপট রাকস্যাক ঝুলিয়ে নিল ওরা পিঠে। দরজা খুলেই লাফিয়ে নামল রানা ঝুড়ি ভর্তি কপির উপর। দ্রুত হাতে কয়েকটা ঝুড়ি সরিয়ে দু'জনের বসবার মত জায়গা করল। তারপর ইশারা করল গিলটি মিয়াকে।

সরু একচিলতে জায়গায় দাঁড়িয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিল আগে গিলটি মিয়া, তারপর ঝুপ করে নামল রানার পাশে। বসে পড়ল দু'জন।

না, চা-নাস্তা নয়, বোধহয় ভাড়া চুকিয়ে দেবার জন্যে নিয়ে গিয়েছিল ওরা ড্রাইভারকে। কারণ এক মিনিট পরেই ফিরে এল তিনজন ট্রাকের কাছে।

'চলি, কাল দেখা হবে আবার,' বলল ড্রাইভার গাড়িতে উঠতে উঠতে।

'পারলে আর একটু সকাল সকাল এসো। গুডবাই।'

স্টার্ট হয়ে গেল এঞ্জিন। খোয়া বিছানো উঁচু-নিচু রাস্তা ধরে নাচতে নাচতে চলল ট্রাক বড় রাস্তার দিকে।

একগাল হাসল গিলটি মিয়া।

'আজকের দিনটা খুব ভাল যাবে, স্যার।'

'কি করে বুঝলে?'

'শুরুটা দেকলেই বোজা যায়। ঘুম থেকে উটেই এই যে তৈরী গাড়ি পেয়ে গেলুম, এটাকে কি বলবেন আপনি? কপাল বলবেন না? আমরা ডেকেচি লরীটাকে? আপনিই এসে হাজির। দেকবেন, দিনটা আজ এরকমই যাবে। ঠিক সোমায় মতন সবকিচু হাজির পাবেন আজকে।'

'দেখা যাক।' সিগারেট ধরাল রানা। 'এবার ম্যাপটা বের করো দেখি। শহরে ঢোকার আগেই নেমে পড়তে হবে আমাদের। কোন্‌দিক থেকে কোনদিকে যাব আগে থেকে দেখে রাখা ভাল।'

ম্যাপটা খুলে পড়ুয়ার নিচে আঙুল রাখল রানা।

'এইখানটায় নেমে যাব আমরা ট্রাক থেকে। শহরে কড়া পাহারার ব্যবস্থা থাকবে। কাজেই আগে নামব। এই যে দেখছ, এটা হচ্ছে পাহাড়ী এলাকা। অ্যাবানোর দিকে রওনা হব আমরা। ওখান থেকে হেঁটে চলে যাব বারবানো। ওখান থেকে ভিনসেনযায় এসে বাস ধরব ব্রেসিয়ার উদ্দেশে। ব্রেসিয়ায় পৌঁছতে পারলে কোন কৌশলে মিলানো পৌঁছানো অসম্ভব হবে না।'

'তারপরেই পেলেনে উটব?'

'সেই চেষ্টাই করব, তবে আগে থেকে বলা যায় না কিছুই। আমাদের আটকাবার সব ব্যবস্থাই করবে ওরা। যে-কোন মুহূর্তে প্ল্যান বদলাতে হতে পারে। আপাতত এই ঠিক থাকল, তারপর যেমন সমস্যা আসবে তার তেমন সমাধান বের করে নেব আমরা চলতে চলতে। আগে থেকে সব সমস্যার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে লাভ নেই।'

আধঘণ্টা বাঁধা-কপি ঝুড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দুলল ওরা ট্রাকের দোলায়। ট্রাকের গতি আঁচ করে নিয়ে মনে মনে অংক কষে বের করল রানা পড়ুয়া পৌঁছতে আর বড়জোর মিনিট দশেক আছে। সাবধানে ঝুড়ি সরিয়ে পথ করে চলে এল ওরা ট্রাকের পিছনে।

চারপাশে একবার চোখ বুলিয়েই মনটা দমে গেল রানার। সমতল খোলা জায়গা। দূরে দেখা যাচ্ছে মাঠে কাজ করছে কয়েকজন কৃষক।

'এখেনে নামলে এস্টেট ধরা পড়ে যাব, স্যার,' বলল গিলটি মিয়া। 'নিয়ন সাইনবোডের মত দেকা যাবে আমাদের তিন মাইল দূর থেকেও।'

'এছাড়া আর কোন উপায় নেই এখন।'

'তা ঠিক। শহরে ঢুকলেই ক্যাঁক করে ধরে নেবে শালারা।'

হাসল গিলটি মিয়া, 'বহুদিন এরকম চোরের মতন পালিয়ে বেড়াইনি, স্যার। বেশ মজাই লাগচে কিন্তু! আপনি সাতে আচেন বলে অত ভয় লাগছে না। তা চলুন, হাঁ করে কি ভাবচেন, নেমে পড়া যাক!'

'দূরে ওই যে পাহাড় দেখা যাচ্ছে, ওই পর্যন্ত নিরাপদে পৌঁছতে পারলে আপাতত সমস্যার শেষ। চলো। আমি রেডি বললেই লাফ দেবে।

টেইলবোর্ড ধরে ঝুলে পড়ল দু'জন। নিচ দিয়ে সড়সড় সরে যাচ্ছে রাস্তা দ্রুতবেগে।

'রেডি!'

একসাথে লাফ দিল দু'জন। কয়েক পা দৌড়ে ঠিক করে নিল ভারসাম্য, তারপর সাঁৎ করে সেঁটে গেল রাস্তার পাশে দেয়ালের গায়ে। আড়াল হয়ে গেল মাঠে কর্মরত লোকগুলো।

চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিয়ে গিলটি মিয়া বলল, 'ওদের চোকে ফাঁকি দিয়ে পাহাড়ে পৌঁচানো যাবে না।'

'ওই পাহাড়ে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে বলে মনে হয়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'দেকতে তো কাচেই মনে হয়, স্যার। কিন্তুক আমার মনে হয়, এই মাট-ঘাট পেরিয়ে ওখেনে পৌঁচতে একটি ঘণ্টা সোমায় তো লাগবেই।' খোঁচা খোঁচা দাড়ি ভর্তি গাল চুলকাল গিলটি মিয়া! 'ওই গোলাঘরে দিনটা থেকে গেলেই বোধায় ভাল করতুম, স্যার।'

'ওই কৃষকগুলো ছাড়া আর কেউ নেই আশেপাশে। ওরা আমাদের নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবে কেন?' ঘড়ি দেখল রানা। সোয়া নয়টা। 'তিরিশ মাইল সরে এসেছি আমরা। কম কথা নয়। চলো, অনুশোচনা না করে এগোনো যাক।'

দেয়াল টপকে মাঠে নামল ওরা। এগোল পাহাড় লক্ষ্য করে।

অসমান জমিতে হাঁটার গতি বাড়ানো যাচ্ছে না। বার বার ঘাড় কাত করে দেখছে ওরা কর্মরত কৃষকদের। পাঁচ-ছয়শো গজ দূরে কাজ করছে ওরা। ব্যস্ত হয়ে আছে কাজে, এদিকে চাইছে না কেউ। চারজন বিট তুলছে খেত থেকে। একজন কাস্তে দিয়ে ঘ্যাচ করে কাটছে বিটের সবুজ মাথা। অপর একজন সাজিয়ে রাখছে একখানা তিন চাকার ঠেলাগাড়িতে।

হাঁটু সমান উঁচু সবুজ ঘাস মাড়িয়ে এগিয়ে চলল ওরা। মাইল দু'য়েক গিয়ে ক্রমে ঢালু হয়ে গেছে জমিটা। এই ঢালের শেষ থেকে শুরু হয়েছে প্রথম পাহাড়। কয়েকটা ছোট ছোট পাহাড় ডিঙিয়ে যেতে পারলে পৌঁছানো যাবে বড় পাহাড়ের গায়ে। তারপর শুরু হবে খাড়াই উতরাই ভেঙে শুধু হাঁটা আর হাঁটা।

লম্বা ঘাসের মাঠ অর্ধেক পেরোতেই দূর থেকে ভেসে এল একটা চিৎকার-ধ্বনি।

'এই সেরেচে, স্যার!'

'সরাসরি ওদের দিকে চেয়ো না!' ধমক দিল রানা। 'ডাকুক। শুনতে পাচ্ছি না আমরা।'

কৃষকদের ছাড়িয়ে মাত্র একশো গজ এগিয়েছে ওরা পাহাড়ের দিকে এমনি সময়ে দেখে ফেলেছে ওদের কেউ। তবে ওদের থেকে পাঁচ-ছয়শো গজ ডাইনে সোজা পাহাড়ের দিকে হাঁটছে রানা ও গিলটি মিয়া, ধরে ফেলা সহজ হবে না। আর একটু জোরে পা চালাল রানা।

আড়চোখে দেখল রানা তিনজন কৃষক হাত নেড়ে ডাকছে ওদের।

'দৌড় দেব, স্যার?'

'পা চালাও, গিলটি মিয়া। ওরা দৌড় দিলে আমরা দৌড়াব, তার আগে নয়।'

'কিন্তুক ডাকচে কেন শালারা? আমরা যা-মন তাই করচি,

ওদের কি?'

'মনে হয় ওদের খবর দিয়ে রেখেছে পুলিস কিংবা কোসা নোস্ট্রা।'

আবার একবার আড়চোখে ওদের দিকে চেয়েই থমকে দাঁড়াল রানা। একজন লোক তীর বেগে ছুটছে একটা ফার্মহাউসের দিকে। বাকি পাঁচজন এগোচ্ছে ওদের দিকে কোণা-কোণি ভাবে। প্রমাদ গুনল রানা। চট করে ফিরল গিলটি মিয়ার দিকে।

'না-হে, আর ভদ্রতা করে লাভ নেই। এসো ওদের দেখিয়ে দিই বাঙালী লৌড় কাকে বলে।'

ছুটল দু'জন। গিলটি মিয়াকে পাঁই পাঁই করে ছুটতে দেখে হেসে ফেলল রানা।

'অত জোরে না। আরও দু'মাইল যেতে হবে আমাদের দৌড়ে। দম পাবে না শেষে।'

মাঝারি গতিতে এগিয়ে চলল দু'জন পাহাড়ের দিকে। ওই পাঁচজনও দৌড়াতে শুরু করেছে। জনা তিনেক খুব জোরে দৌড়াচ্ছে, রানা বুঝতে পারল বড়জোর পাঁচশো গজ দৌড়াবে ওরা ওই গতিতে, তারপর শুয়ে পড়বে চিৎ হয়ে। ঢালের কাছাকাছি দৌড়ের গতি আর একটু বাড়িয়ে দিল রানা। পাহাড় আরও দেড় মাইল।

পিছন ফিরে দেখল রানা, প্রায় দু'শো গজের মধ্যে এসে গিয়েছিল তিনজন, এখন পিছিয়ে যাচ্ছে আবার। বেশ অনেকখানি পিছনে আরও চারজন লোককে দেখতে পেল রানা। একজনের মাথায় কৃষকদের মাথাল, বাকি তিনজনের মাথায় হ্যাট। প্রাণপণে ছুটছে ওরা।

দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছল ওরা পাহাড়ের গায়ের কাছে। একটু হাঁপ ধরেছে দেখে মনে মনে স্থির করল রানা এবার ঢাকায় ফিরে স্কিপিং-এর মাত্রা বাড়িয়ে দেবে। পাঁচ ফুট উঁচু একটা

দেয়াল ডিঙিয়ে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় পড়ল ওরা। রাস্তা পেরিয়ে আবার একটা দেয়াল। সেটা পেরিয়ে উঠতে শুরু করল ওরা পাহাড়ে।

পিছনের চারজন ধরে ফেলেছে সামনের পাঁচজনকে। বেশ অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে এগোচ্ছে ওরা।

একই গতিতে পাহাড়ে উঠতে বেশ কষ্ট হচ্ছে কিন্তু গতি কমাল না রানা। দশ মিনিট পর পাহাড়ের মাথায় উঠে থেমে দাঁড়িয়ে চাইল পিছন ফিরে। বেশ জোরে হাঁপাচ্ছে ওরা এখন।

তিনজন এখনও দৌড়াচ্ছে ঢালু মাঠে, জনা চারেক দেয়াল টপকাচ্ছে, আর দু'জন উঠতে শুরু করেছে পাহাড় বেয়ে। হাঁপাচ্ছে হাপরের মত।

প্রায় দৌড়ে নামতে শুরু করল ওরা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। অনেকখানি নেমে আসবার পর আরেকটা দেয়াল পাওয়া গেল সামনে। সেটা টপকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা।

'রেলওয়ে! এটার কথা খেয়াল ছিল না আমার!' বলল রানা।

আর একটু নেমে রেল লাইন দেখতে পেল ওরা। পাহাড়ের খানিকটা অংশ প্রায় খাড়াভাবে কেটে বসানো হয়েছে রেল লাইন।

হেসে উঠল গিলটি মিয়া। চট করে চাইল রানা ওর দিকে। কান খাড়া করে কি যেন শোনার চেষ্টা করছিল গিলটি মিয়া। ঘাড় সোজা করে চাইল রানার দিকে।

'এই দেকুন, স্যার, বলেছিলাম না দিনটা ভাল যাবে! কপাল আর কাকে বলে!'

কি ব্যাপারে কথা বলছে সেটা আর জিজ্ঞেস করতে হলো না রানাকে, গিলটি মিয়া থামতেই অস্পষ্টভাবে কানে এল ট্রেনের শব্দ। হাসি ফুটে উঠল রানার মুখে। ভুরু কপালে তুলে মাথাটা ডানদিকে কাত করল গিলটি মিয়া। ভাবটা- এই দেখুন!

আছড়ে-পাছড়ে দশ ফুট প্রায়-খাড়া পাহাড় বেয়ে নেমে এল

ওরা নিচে। রেল লাইনের পাশ দিয়ে দৌড় দিল গজ-পঞ্চাশেক দূরে ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করবে বলে। ঝোপের আড়ালে পৌঁছবার সাথে সাথেই এঞ্জিনের নাকটা দেখতে পেল রানা। মোড় ঘুরে বেরিয়ে আসছে পাহাড়ের আড়াল থেকে।

মস্ত লম্বা এক মালগাড়ি। ওয়াগনের পর ওয়াগন- যেন শেষ নেই। টেনে নিয়ে এগোতে গিয়ে এঞ্জিনের জিভ বেরিয়ে যাওয়ার দশা। বড়জোর পনেরো কি ষোলো মাইল স্পীডে পার হয়ে গেল এঞ্জিনটা রানাদের লুকিয়ে থাকা ঝোপের পাশ দিয়ে। পরিষ্কার দেখা গেল ড্রাইভার ও ফায়ারম্যানকে। গিলটি মিয়ার কনুই ধরে টান দিল রানা। বেরিয়ে গেল আড়াল থেকে।

প্রথম দশ বারোটা বন্ধ ওয়াগন পেরিয়ে যেতে দিল ওরা। তারপরই এল গোটা কয়েক ছাত খোলা নিচু ওয়াগন, একটা করে হলুদ পেইন্ট করা ঝকঝকে ট্রাক্টর বসানো আছে প্রত্যেকটায়। ছ'সাত গজ দৌড়ে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল ওরা দ্বিতীয় খোলা ওয়াগনে।

'লুকিয়ে পড়ো, গিলটি মিয়া।' বলেই এক গড়ান দিয়ে ট্রাক্টরের আড়ালে চলে গেল রানা।

গিলটি মিয়াও এল পিছু পিছু।

খট্ খট্ খটাখট, খট্ খট্ খটাখট- এগিয়ে চলল মালগাড়ি। বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর ট্রাক্টরের আড়াল থেকে দেখতে পেল রানা, পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে ট্রেনের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে একজন লোক আরেকজনকে। মোড় ঘুরে আড়াল হয়ে গেল ট্রেনটা, দেখা যাচ্ছে না ওদের। উঠে বসল রানা।

'ওরা বুঝে নেবে আমরা পাড়ি জমিয়েছি এই ট্রেনে করেই। কিছু না, সামনের স্টেশনে শুধু একটা ফোন করে দিলেই হাতকড়া লাগিয়ে দেবে রেলওয়ে পুলিস।'

'আগে হাতের কাচে টেলিফোন পেতে হবে না ওদের?'

নিশ্চিন্ত মনে রাকস্যাক খুলে খাবার বের করতে শুরু করেছে গিলটি মিয়া।

'পরের তিনজন পুলিসের লোক হলে আর ফোন পর্যন্ত পৌঁছতে হবে না, গাড়িতে পৌঁছে ওয়্যারলেসে খবর দিলেই চলবে। যাই হোক, আগে খেয়ে নেয়া যাক, তারপর ভেবে বের করা যাবে কি করা যায়।'

আধ ডজন করে স্যাণ্ডউইচ, দুটো করে আপেল, আর সামান্য কিছু আঙ্গুর দিয়ে নাস্তা সারল ওরা।

আউন্স দু'য়েক ব্র্যাণ্ডি ঢেলে নিল রানা ফ্লাস্কের মুখে। গিলটি মিয়া পানি খেল শুধু, এসব খেলে নাকি বমি আসে ওর। ম্যাপটা বিছিয়ে নিয়ে তার উপর ঝুঁকে পড়ল রানা।

'এহ্-হে! দশ মাইল পরেই ক্যাসেলফ্রাংকো স্টেশন,' বলল রানা। 'দাঁড়াও, এই যে আরেকটা লাইন দেখা যাচ্ছে, ক্যাসেলফ্রাংকো ছুঁয়ে চলে গেছে ভিন্সেন্যা। ওই ট্রেনে একটু জায়গা করে নিতে পারলে বোঝা যাবে সত্যিই আজ কপালটা খুলে গেছে।'

'শিম্পাঞ্জী না কি যেন বললেন, ওখানে গিয়ে কি করব?'

'সারাদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকব, তারপর সন্ধের পর একটা বাসে উঠে রওনা হয়ে যাব ভেরোনার পথে।'

'তার মানে আর হাঁটতে হচ্ছে না। ওফ্, বাঁচালেন, স্যার। আবার যদি হাঁটতে বলতেন, তাহলেই কম্মো কাবার হয়ে গিয়েছিল আমার।'

'কিছুই বলা যায় না, গিলটি মিয়া। অত খুশি হয়ো না। অবস্থা খারাপ দেখলে আবার পাহাড়ী পথ ধরব আমরা।'

*

নীল আর ঘিয়ে রঙের মস্ত সি.আই.টি. বাসটা থেমে দাঁড়াল বাস স্টপেজে। দশ-বারোজন যাত্রী বসে আছে ভিতরে, আরও সাত-

আটজন নারী-পুরুষ বাস-শেল্টার ছেড়ে এগোল বাসের দিকে। নামল না কেউ। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে প্রত্যেকটা মুখ পরীক্ষা করে দেখে নিয়ে কনুই দিয়ে গুঁতো দিল রানা গিলটি মিয়ার পাঁজরে।

উঠে পড়ল ওরা বাসে। ভেরোনার টিকেট কাটল রানা। এগিয়ে গিয়ে একেবারে ড্রাইভারের কাছাকাছি একটা সীটে বসে পড়ল দু'জন রাকস্যাক দুটো লাগেজ র‍্যাকে গুঁজে দিয়ে।

বাসটা ছেড়ে দিতেই বিরাট একটা হাঁপ ছেড়ে রানার দিকে ফিরল গিলটি মিয়া। ফিস্ফিস্ করে বলল, 'ভাগ্যদেবি ছাড়েনি আমাদের, স্যার, একোনো আচে কাঁদের ওপর।'

বেলা একটা দেড়টার দিকে ভিন্সেন্যায় পৌঁছে গেছে ওরা। সারাটা দিন কাটিয়েছে একটা সিনেমা হলে পর পর তিনটে ছবি দেখে। সন্ধে একটু ঘন হয়ে আসতেই বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে এই বাস-স্ট্যাণ্ডে।

'ভেরোনায় পৌঁছে একটা গাড়ি চুরির চেষ্টা করতে হবে,' বলল রানা। 'ভাড়া নিতে গেলেই ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। রাতারাতি যদি ব্রেসিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারি, তাহলে বুঝব সত্যিই কাজের কাজ হলো।'

'মিলানো পর্যন্ত সেই গাড়িতে গেলে ক্ষতি কি?' জিজ্ঞেস করল গিলটি মিয়া।

'অটোস্ট্রাডা পেরোনো মুশকিল হবে।'

'সেটা আবার কি?'

'ব্রেসিয়া থেকে মিলানো পর্যন্ত মোটরের রাস্তাকে অটোস্ট্রাডা বলে। টিকেট কাটতে হয় ওই রাস্তা ব্যবহার করতে হলে। দু'মাথায় পুলিসের চেক পোস্ট আছে। ধরা পড়ে যাব।'

'কোনও লরীর পেচনে উটে বসলেই হয়।'

'আমাদের খোঁজে আছে ওরা,' বলল রানা। 'সার্চ করতে পারে।'

‘তাহালে অন্য কোন রাস্তায় গেলেই হয়। আর রাস্তা নেই?’

‘আগে গাড়ি তো একটা সংগ্রহ করি, তারপর দেখা যাবে কি করা যায়।’

আটটা চল্লিশে থামল বাস ট্যাভারনিল বাস-স্টপেজে। গোলমালের জন্য মনে মনে তৈরি ছিল ওরা, কিন্তু এতই আকস্মিকভাবে ঘটল ব্যাপারটা যে রীতিমত চমকে উঠল দু’জন।

বাস-স্টপেজে আলো ছিল না, কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে বাসের ভিতরের আলোয় নিজেরই ছায়া দেখতে পাচ্ছিল রানা। বাইরেটা অন্ধকার।

দরজা খুলে গেল, ক্র্যাশ-হেলমেট পরা একজন মোটরসাইকেল সার্জেন্ট দাঁড়াল সেখানে এসে। পিঠে ঝুলানো অটোমেটিক কারবাইন, ডান হাতটা ওয়েইস্ট-হোলস্টারে রাখা রিভলভারের বাঁটের উপর। মুহূর্তে ফ্যাকাসে হয়ে গেল গিলটি মিয়ার মুখটা।

প্রত্যেকটা প্যাসেঞ্জারের মুখের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে স্থির হলো সার্জেন্টের চোখ দুটো রানার মুখে এসে। তারপর দেখল গিলটি মিয়াকে।

‘এই সেরেচে!’ ঠোঁট না নড়িয়ে বলল গিলটি মিয়া।

‘বোঝা যাচ্ছে, কপালটা খুব ভাল আজ!’ টিটকারির সুরে বলল রানা।

‘দিনটা ভাল যাবে বলেচি, স্যার,’ রেগে গেল গিলটি মিয়া। ‘রাতের কতা তো বলিনি!’

‘আমি বলছি। রাতটাও ভাল যাবে। তুমি শুধু আমার ইঙ্গিতের অপেক্ষায় থেকো।’

‘আপনারা দয়া করে বাইরে আসুন,’ তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল সার্জেন্ট।

বোকার মত চেয়ে রইল রানা ওর দিকে।

‘আমাকে কিছু বলছেন?’

‘আপনাদের দু’জনকে। একটু বাইরে আসুন, সিনর।’

‘কেন? কি ব্যাপার!’ যেন আকাশ থেকে পড়ল রানা।

আর সব প্যাসেঞ্জার হাঁ করে চেয়ে আছে ওদের দিকে। ড্রাইভার ঘাড় ফিরিয়ে দেখছে সার্জেন্টকে, চোখে-মুখে অস্বস্তি। ওর বাসের ভিতর কোন গোলমাল হোক সেটা ও চায় না।

‘আপনাদের কাগজপত্র দেখতে হবে,’ বলল ধৈর্যের প্রতিমূর্তি সার্জেন্ট। ‘নেমে আসুন।’

হতাশ ও বিরক্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা, উঠে দাঁড়িয়ে রাকস্যাকটা নামাল, ওটা পরতে পরতে বলল, ‘তোমারটা হাতেই রাখো, গিলটি মিয়া। এই ব্যাটাকে কাবু করতে হতে পারে। তৈরি থেকো।’

বাস ড্রাইভার চিৎকার করে প্রশ্ন করল, ‘কত দেরি হবে আপনাদের? এমনিতেই লেট হয়ে গেছি।’

‘এদের জন্যে অপেক্ষা করবার দরকার নেই,’ বলল সার্জেন্ট। ‘তুমি রওনা হতে পারো।’ কথাটা বলেই রাস্তায় নেমে দাঁড়াল সে, রানাকে উদ্দেশ করে বলল, ‘জলদি!’

বুঝতে কিছুই বাকি রইল না রানার। গিলটি মিয়ার দিকে চেয়ে হাসল অভয়-হাসি। এগোল দরজার দিকে।

রাস্তায় নেমে কালো হয়ে গেল গিলটি মিয়ার মুখ। আরও দু’জন সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে। একজনের হাতে কারবাইন।

‘এই সেরেচে! এরা দেকচি তিনজন!’

সাত

ছেড়ে দিল বাস। চলে গেল মাটি কাঁপিয়ে।

প্রথম সার্জেন্টটা ঘাড় কাৎ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটা মোটর

সাইকেলের হেডলাইট জ্বেলে দিল। হাত বাড়াল।

'পাসপোর্ট প্লীজ।'

ভিতরের পকেটে হাত ঢোকাল রানা। পিস্তলের বাঁটটা ঠেকল হাতে। লক্ষ করল দ্বিতীয় সার্জেন্ট উঁচু করল কারবাইনটা। সোজা রানার বুকের দিকে লক্ষ্য করে ধরা ওটা। পাসপোর্টটা বের করে আনল রানা, এগিয়ে দিল বাড়িয়ে রাখা হাতে।

তিন সেকেণ্ড পরীক্ষা করেই মাথা ঝাঁকাল সার্জেন্ট। গিলটি মিয়ার দিকে হাত বাড়াল ওর পাসপোর্টের জন্যে।

'তোমার পাসপোর্ট বের করে দাও,' বলল রানা।

বিনা বাক্য ব্যয়ে পাসপোর্ট বের করে দিল গিলটি মিয়া।

'আপনাদের দু'জনকেই অ্যারেস্ট করা হলো,' গিলটি মিয়ার পাসপোর্টে চোখ বুলিয়ে বলল প্রথম সার্জেন্ট। 'আমাদের সাথে যেতে হবে আপনাদের।'

'আমাদের বিরুদ্ধে চার্জটা কি?' ডান হাতে গলার কাছে চুলকাল রানা।

অবাক হলো গিলটি মিয়া। তিনজন দেখে গোলমাল করার সম্ভাবনাটা দূর করে দিয়েছিল ও মন থেকে। রানাকে গলা চুলকাতে দেখে চমকে উঠল সে ভিতর ভিতর। এটা রানার সিগন্যাল। জানে সে। অবাক হলো, কিন্তু এক সেকেণ্ড দেরি করল না সে সিদ্ধান্ত নিতে। কারবাইন ধরা সার্জেন্টকেই পছন্দ হলো ওর।

রাকস্যাকের স্ট্র্যাপ ধরে ওটাকে কাঁধের উপর দিয়ে পিঠে রেখেছিল গিলটি মিয়া, ধাঁই করে মারল ওটা দিয়ে কারবাইনধারীর মুখে। ব্র্যাণ্ডির বোতলের নিচের দিকটা দড়াম করে পড়ল লোকটার নাকের উপর। তীব্র যন্ত্রণায় দিশেহারা লোকটা কারবাইন ফেলে দিয়ে বসে পড়ল মাটিতে চার হাত পায়ে ভর দিয়ে।

বিদ্যুৎবেগে রিভলভারের বাঁটে হাত চলে গেল বাকি দু'জনের, কিন্তু থমকে গেল ওরা। রানার হাতে চকচক করছে ওর ওয়ালথার পি.পি. কে।

'নড়েচ কি মরেচ!' গিলটি মিয়াও বের করে ফেলেছে ওর ভয়ঙ্কর-দর্শন খেলনা-পিস্তল।

বাংলা কথা বুঝল না ওরা, কিন্তু বক্তব্য বুঝতে পারল পরিষ্কার। পাথর হয়ে জমে গেল একেবারে।

কারবাইনটা মাটি থেকে তুলে নিল গিলটি মিয়া বাম হাতে। রেখে এল কয়েক হাত তফাতে। একে একে সব ক'টা কারবাইন ও রিভলভারই চলে গেল সেখানে।

'পিছন ফিরে দাঁড়াও!' হুকুম করল রানা। ওরা পিছু ফিরতেই ইটালিয়ান ভাসায় হুকুম করল গিলটি মিয়াকে, এদের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকো। যে একটু নড়বে তাকেই শেষ করে দেবে।'

দ্রুতহাতে দুটো মোটর সাইকেল থেকে স্পার্কিং প্লাগ খুলে পকেটে রাখল রানা। তৃতীয়টার পেট্রল ট্যাংক পরীক্ষা করে দেখে নিয়ে স্টার্ট দেয়া অবস্থায় রেখে অটোমেটিক কারবাইন থেকে ম্যাগাজিনগুলো খুলে ছুঁড়ে দিল অন্ধকারে, তিনটে তিন দিকে। রিভলভারগুলোও গেল ওগুলোর পিছু পিছু। তারপর এগিয়ে এসে তর্জনী দিয়ে জোরে একটা খোঁচা দিল প্রথম সার্জেন্টের পাঁজরে। চমকে উঠল লোকটা।

'পাসপোর্ট!'

পিছন ফিরে না চেয়ে পাসপোর্ট দুটো ফেরত দিল লোকটা। চাপা গলায় বলল, 'ধরা পড়তেই হবে তোমাদের। কতদূর যাবে?'

গর্জন করে উঠল রানাগু 'চোপরাও ইস্টুপিড, পিটিয়ে তোমায় করব ঢিট!'

'কি বললেন?'

'ও তোমরা বুঝবে না, সুকুমার রায়ের ছড়া। এখন এই রাস্তা

ধরে সিধে হাঁটতে শুরু করো। থামলেই গুলি খাবে। কুইক মার্চ!'

বুটের শব্দ তুলে এগোল ওরা তিনজন অন্ধকার রাস্তা ধরে।

একলাফে উঠে বসল রানা চালু মোটর সাইকেলের উপর। গিলটি মিয়া আছড়ে-পাছড়ে উঠে পড়ল পিছনে। রানার কানের কাছে মোলায়েম কণ্ঠে বলল, 'বলেছিলাম না, দিনটা ভাল যাবে?'

তীরবেগে ছুটল ওরা ভেরোনার পথে।

বিশ মিনিট একটানা চলবার পর মোটর সাইকেলের গতি কিছুটা কমাল রানা। ততক্ষণে বাসকে ছাড়িয়ে বহুদূর চলে এসেছে ওরা।

'আবার থামচেন কেন, স্যার?'

'আর বেশিদূর এটাতে করে যাওয়া ঠিক হবে না। এতক্ষণে সারা ইটালির টহল-পুলিসকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। ঢিল খাওয়া ভীমরুলের মত ছুটছে ওরা চারদিকে। ডাইনে মোড় নেব এবার আমরা।'

'তারপর?'

'তারপর আবার পাহাড়। আবার হাঁটা। ভাবছি এবার সোজা সুইটজারল্যাণ্ডের বর্ডারের দিকে হাঁটা ধরব।' ডানদিকে একটা রাস্তা পেয়ে মোড় নিল রানা। 'মোটর সাইকেলটা ভালমত লুকিয়ে রাখতে পারলে ওরা মনে করতে পারে আমরা ভেরোনায় চলে গিয়েছি।'

রাস্তাটা রাঙামাটির রাস্তার মত উঁচু-নিচু। রানা অনুভব করতে পারল, ক্রমে উপর দিকে উঠছে ওরা। ফাইভ হাণ্ডরেড সি.সি.হারলি ডেভিডসনের পক্ষে এই ঊর্ধ্বগতি কিছুই নয়। স্বচ্ছন্দ গতিতে উঠে যাচ্ছে সড়সড় করে। পথটা ক্রমে এবড়ো-খেবড়ো হয়ে উঠছে, কিন্তু তাতে তেমন কোন অসুবিধে ছিল না, ঝাঁকি খেতে খেতে বহুদূর চলে যেতে পারত ওরা, কিন্তু তৃতীয় পাহাড়টার মাথায় উঠে বহুদূরে একটা গ্রাম দেখতে পেল রানা।

থেমে দাঁড়াল। অফ করে দিল সুইচ।

'ওই গ্রামের পাশ দিয়ে এটা নিয়ে গেলে শব্দ শুনতে পাবে ওরা। পুলিস জিজ্ঞাসা করলে বলে দেবে। কাজেই আরামের ভ্রমণ এইখানেই শেষ। নেমে পড়ো, গিলটি মিয়া।'

মোটর সাইকেলটা ঠেলে নিয়ে রাস্তা থেকে বেশ অনেকটা দূরে সরে গেল রানা। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর একটা বড়সড় ঝোপ পাওয়া গেল। যথেষ্ট সময় ব্যয় করে খুবই যত্নের সাথে লুকিয়ে রাখল ওরা মোটর সাইকেলটাকে। এর উপর নির্ভর করছে অনেকখানি। এটা পেলেই বুঝে নেবে ওরা কোন্‌দিকে গেছে পলাতক আসামী। বার-কয়েক চারপাশ থেকে টর্চ ফেলে দেখে নিশ্চিন্ত হলো রানা। আকাশ থেকে দেখা যাবে, কিন্তু পায়ে হেঁটে এর দু'হাত তফাৎ দিয়ে চলে যাবে যে কেউ, নজরে পড়বে না মোটর সাইকেল।

সন্তুষ্ট চিত্তে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল রানা। পিছনে বিমর্ষবদন গিলটি মিয়া।

'কদ্দূর হাঁটতে হবে, স্যার?' জিজ্ঞেস করল গিলটি মিয়া খানিক উসখুস করে।

'দূর খুব বেশি না,' হাসল রানা। 'সোজাসুজি যেতে পারলে বড় জোর পঞ্চাশ-ষাট মাইল। কিন্তু এঁকেবেঁকে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে যেতে হবে আমাদের। পাঁচ-ছয় দিন লাগবে বর্ডারে পৌঁছতে। টিরানোতে একবার পৌঁছতে পারলে সোজা জুরিখ চলে যাব আমরা। সেখান থেকে প্লেন পেতে অসুবিধে হবে না।'

'আমরা বর্ডার ক্রস করলেই এরা সব হাত গুটিয়ে নিয়ে হাল ছেড়ে দেবে?'

'সিলভিও ছাড়বে না। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে সুইস পুলিসের কোন অভিযোগ নেই, অন্তত ওদিক থেকে বাঁচা যাবে। দুই তরফের তাড়া থেকে বাঁচতে পারলে আমাদের পক্ষে আত্মরক্ষা

করা সহজ হবে।'

গত কালকের মরা চাঁদটায় একটু প্রাণ এসেছে আজ। বেশ আলো দিচ্ছে। পরিষ্কার স্বচ্ছ নীল আকাশ। অসংখ্য তারা জ্বলজ্বল করছে সারা আকাশ জুড়ে। চাঁদ না থাকলেও পথ চলতে অসুবিধে হত না।

নিঃশব্দে হেঁটে চলল ওরা। কখনও খাড়াই, কখনও উৎরাই। পথের পাশে গ্রামগুলো ঘুমিয়ে আছে নিঝুম হয়ে। ছায়ার মত হেঁটে চলে গেল ওরা পাশ দিয়ে। টের পেল না কেউ।

পাঁচ ঘণ্টা সমান গতিতে একটানা হাঁটবার পর থামল রানা একটা পাহাড়ের চূড়ায়।

'কষ্ট হচ্ছে, গিলটি মিয়া?'

'কি যে বলেন, স্যার!' অমায়িক হাসি হাসল গিলটি মিয়া। 'আমি আরও ভাবছিলুম আপনার কতা। আমার পাকীর মত শরীল, ওজনই বা কতটুকু যে টানতে কষ্ট হবে?' একটু ইতস্তত করে বলল, 'তবে হ্যাঁ, খিদে লেগেছে খুব জোর, এটুকু বলতে পারি। কিচু যদি মুকে দিতে বলেন, আপত্তি করব না।'

বসে পড়ল রানা। বেশ ক্লান্তি বোধ করছে সে। কিন্তু বেশিক্ষণ বিশ্রাম নেয়া যাবে না, রাত শেষ হবার আগেই ঢুকে যেতে হবে পাহাড়ী এলাকার একেবারে গভীর অঞ্চলে। কোনরকম ঝুঁকি নেয়া চলবে না আর।

খাওয়া সেরে দু'পেগ ব্র্যাণ্ডি ঢেলে নিয়ে কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ল রানা, সিগারেট ধরাল একটা। ফুরফুরে পাহাড়ী বাতাসে ঘুম এসে যাওয়ার জোগাড় হলো।

'উই যে দেকা যাচ্চে দূরে, স্যার, ওটা কি?'

'লেক গার্ডা। ওই লেকের পাশ দিয়ে গেছে টেস্ন্টো রোড। ওটা পেরিয়ে সোজা উত্তর-প মে হাঁটতে শুরু করব আমরা। অনেকগুলো ছোট-খাট পর্বত ডিঙাতে হবে আমাদের। রাস্তাঘাট

সুবিধের নয়। একেবারে বাজে। কষ্ট হবে খুব।'

'সেজন্যে পরোয়া করি না, স্যার। কষ্ট জীবনে কম করিনি। একেক দিন যে পিটুনি শুরু করত আপতাব দারোগা…উফ্! রাম পিটুনি। হেগে মুতে একাকার করে ফেলতুম। তবু স্যার স্বীকার যেতুম না চুরির মাল কোতায় রেকেচি। বলে দিলে যে ধরা পড়ে যায় আমারই কোন স্যাঙাৎ।' আবার জীবন-চরিত বর্ণনা করতে শুরু করেছে টের পেয়ে থেমে গেল গিলটি মিয়া। হাসল। 'কী সুন্দর সব দিশ্য দেকতে দেকতে চলেচি, স্যার। ভালই লাগচে। দেশ দেকা তো হচ্চে!'

হেসে উঠল রানা।

'তোমাকে সাথে না আনলে ভুলই করতাম। একা একা এত পথ চলতে খুবই খারাপ লাগত।' উঠে বসল রানা। অবশিষ্ট ব্র্যাণ্ডিটুকু গলায় ঢেলে নিয়ে ফ্লাস্কের মুখটা রেখে দিল যথাস্থানে। সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে উঠে দাঁড়াল। 'চলো, আরও খানিকটা দেশ দেখা যাক।'

চলছে তো চলছেই।

বহু দূরে উঁচু পর্বতের চুড়োয় সূর্যের আলো দেখে বুঝল রানা সকাল হতে আর খুব বেশি দেরি নেই। আবার খুব বেশি তাড়াহুড়োও নেই। দু'ঘণ্টার আগে ভোর হবে না সমতল ভূমিতে। ভেরোনা টেস্ন্টো রোড পার হয়ে এসেছে ওরা বেশ কিছুক্ষণ হয়। খাড়াই-উৎরাই ভেঙে এগিয়ে চলেছে আরও, আরও অভ্যন্তরে।

বেলা সাড়ে নয়টা নাগাদ পর্বত ডিঙিয়ে উঠে এল সূর্য। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস উত্তপ্ত হয়ে উঠতে বেশি সময় লাগল না। অবসন্ন পা টেনে টেনে আরও আধঘণ্টা চলার পর পর্বতমালার চতুর্থ সারির মাথায় উঠল ওরা।

'ব্যস! আর না।' থেমে দাঁড়াল রানা। 'লম্বা একটা ঘুম দিয়ে

উঠে তারপর রওনা হওয়া যাবে আবার।'

'ওহ্! কী সুন্দর!' পিছন ফিরে চেয়েই মুগ্ধ হয়ে গেল গিলটি মিয়া।

একটা ঘন ঝোপের ছায়ায় বসে পড়ল ওরা। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে লেক গার্ডা। মনে হচ্ছে হলুদ রোদের চাদর গায়ে দিয়ে ঘুমিয়ে আছে বিশাল লেকটা। খেলনার মত দেখা যাচ্ছে দূরে দূরে কয়েকটা ফার্ম-হাউস, মাঠ, খেত-খামার। গরু চরে বেড়াচ্ছে মাঠে। মস্ত গাছগুলোকে মনে হচ্ছে ছয় ফুট উঁচু। সত্যিই অপূর্ব। হঠাৎ মনে হয় স্বপ্নের ঘোরে আছি।

রাকস্যাক থেকে দুটো চাদর বের করে বিছিয়ে ফেলল গিলটি মিয়া। রানা অনুভব করল ক্লান্তিতে অল্প অল্প কাঁপছে ওর হাত-পা। শোয়ার প্রায় সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়ল দু'জন। কি যেন জিজ্ঞেস করেছিল গিলটি মিয়া ঘুমজড়িত কণ্ঠে, উত্তর দেয়া হয়নি, দিলেও সে শুনতে পেত কিনা সন্দেহ।

ঘণ্টা তিনেক নিশ্চিন্তে ঘুমানোর পরই বিচিত্র দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করল রানা। প্রথমে দেখল পা পিছলে বিরাট একটা খাদে পড়ে যাচ্ছে সে। পড়ছে তো পড়ছেই- বাঁচার কোন আশা নেই। হঠাৎ দেখল আশ্চর্য সুন্দর দুটো পাখা গজিয়েছে ওর পিঠে। খিলখিল করে হাসছে একটা মেয়ে। আরে, মেয়ে তো নয়, অপূর্ব সুন্দরী এক পরী। দু'জনে মিলে উড়তে শুরু করল ওরা, হাওয়ায় ভেসে নিঃশব্দে উড়ছে ওরা মেঘের পাশ দিয়ে। মেঘটা হঠাৎ একটা মৌচাক হয়ে গেল। তেড়ে আসছে অসংখ্য মৌমাছি। পালা, পালা, পালা! মেয়েটাকে আর দেখতে পেল না রানা। বোঁ বোঁ ছুটে আসছে খুদে খুদে খ্যাপা কীট। মৌমাছিগুলো হঠাৎ ভীমরুল হয়ে গেল। দ্বিগুণ বেগে আসছে এখন। এবার রীতিমত ভয় পেল রানা, জোরে জোরে পাখা নাড়তে শুরু করল। এমন সময় মটাশ করে ভেঙে গেল একটা ডানা। ভাঙা ডানাটা হাতে

নিয়ে ভীমরুল খেদাচ্ছে, আর এক ডানা ঝাপটাচ্ছে রানা। ডানায় গুলি খাওয়া শকুনের মত পাক খেতে খেতে নেমে আসছে নিচে। ক্রমে বাড়ছে পতনের বেগ। রানা বুঝতে পারল, স্বপ্ন দেখছে সে। প্রায় জেগে উঠে পাশ ফিরল। কিন্তু ভীমরুলের গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছে সে এখনও।

হঠাৎ সচকিত হয়ে চোখ মেলল রানা। শব্দের উৎস আন্দাজ করে চাইল সেদিকে এবং সাথে সাথেই আড়ষ্ট হয়ে গেল। কয়েক মাইল দূরে প্রকাণ্ড গঙ্গা ফড়িংয়ের মত উড়ছে একটা হেলিকপ্টার।

'ও কিচু নয়, স্যার,' মৃদুকণ্ঠে বলল গিলটি মিয়া। 'একটা পেলেন। পোকা মারার ওষুদ ছিটাচ্চে বোধায়।'

'নোড়ো না, গিলটি মিয়া। চুপচাপ পড়ে থাকো যেমন আছ। না। তারচেয়ে ঢুকে পড়ো চাদরের তলায়। এদিকে যদি আসেও, দেখতে পাবে না আমাদের।'

'পুলিসের পেলেন বলে সন্দো করচেন?'

'মনে হয় সিলভিওর দলের। সরকারী হেলিকপ্টার নয়।'

কয়েক মাইল দূর দিয়ে চলে গেল হেলিকপ্টার, ছোট্ট একটা বিন্দুতে পরিণত হলো, তারপর আবার ফিরে আসতে শুরু করল। মাইলখানেক এগিয়ে এসেছে এবার।

'খুঁজচে আমাদের, স্যার!' চোখ বড় বড় হয়ে গেল গিলটি মিয়ার। 'গরু খোঁজা করচে সারাটা এলাকা!'

রাকস্যাক থেকে শক্তিশালী বিনকিউলারটা বের করে চোখে লাগাল রানা। একলাফে অনেকটা সামনে চলে এল হেলিকপ্টার। হেলমেট মাথায় পাইলটকে দেখতে পেল রানা পরিষ্কার, কিন্তু অপর একজন লোক ওপাশের জানালা দিয়ে নিচের দিকে চেয়ে রয়েছে, তাকে ঠিকমত চিনতে পারল না। পিছন থেকে রিক্কির মত লাগল কিছুটা, তবে অন্য যে-কেউ হতে পারে। আর একটু এগিয়ে যেতেই দৃষ্টিপথের আড়াল হয়ে গেল লোকগুলো।

'পুলিসের হেলিকপ্টার না ওটা। কোসা নোস্ট্রা খুঁজছে আমাদের।' ঘোষণা করল রানা।

'আমাদের কিচু করার আচে বলে তো মনে হচ্চে না, স্যার।'

রানা টের পেল, সত্যি করবার তেমন কিছুই নেই এখন ওদের। আরও মাইলখানেক কাছে সরে এল হেলিকপ্টার অমোঘ নিয়তির মত।

'তা ঠিক,' বলল রানা। 'কিন্তু নড়াচড়া না করলে আমাদের খুঁজে বের করা সহজ হবে না। চাদর মুড়ি দিয়ে বিশেষ সুবিধে হবে বলে মনে হয় না। এবার ওটা দূরে সরে গেলে আমরা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ব হামাগুড়ি দিয়ে।'

'মনে হচ্চে ব্যাটারা পরিষ্কার জানে যে আমরা এইদিকেই কোথাউ নুকিয়ে আচি।'

'আকাশ থেকে মোটর সাইকেলটা দেখতে পেয়েছে খুব সম্ভব,' বলল রানা।

ধীরে ধীরে বহুদূরে একটা ছোট্ট বিন্দুতে পরিণত হলো হেলিকপ্টার। রাকস্যাক আর চাদর নিয়ে তিন ফুট উঁচু ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে সরে এল ওরা হামাগুড়ি দিয়ে। ঘন পাতা ছাউনি তৈরি করল ওদের শরীরের উপর। তবু গলা পর্যন্ত চাদর মুড়ি দিতে বলল রানা গিলটি মিয়াকে। পাতার ফাঁক দিয়ে নীল আকাশের দিকে চেয়ে উপর থেকে এই ঝোপটা কেমন দেখাবে কল্পনা করবার চেষ্টা করল রানা। কল্পনায় শুধু একরাশ ঝোপ-ঝাড় দেখা গেল, নিজেদের দেখতে পেল না সে। নিশ্চিন্ত মনে হাসল রানা।

কয়েক মিনিট পরই বাড়তে শুরু করল আওয়াজ। আসছে। ক্যাড়কেড়ে বিশ্রী শব্দটা কানে লাগছে। পাতার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল রানা ওটাকে। কাছেই একটা পাহাড়ের মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে ওটা, মাত্র বিশ ফুট উঁচু দিয়ে। হঠাৎ নিরাপত্তা

সম্পর্কে অনি য়তা দেখা দিল রানার মনে। এই ঝোপের আড়ালে ওরা সত্যিই কি নিরাপদ? কিন্তু এখন আর এখান থেকে সরে যাওয়ার কোন উপায় নেই।

দুইশো গজ দূর দিয়ে উড়ে চলে গেল হেলিকপ্টার। পাখার বাতাসে রুক্ষ ঘাসগুলোকে শুয়ে পড়তে দেখল রানা। কটকট কটকট করতে করতে চলে গেল ওটা লেকের দিকে।

'লেকের ওপর আর খুঁজবে না, এক্ষুণি ফিরে আসবে ওটা,' বলল রানা। 'এবার আমাদের মাথার ওপর দিয়ে যাবে। মড়ার মত পড়ে থাকো, গিলটি মিয়া।'

'দেকে যদি ফেলেও, কি হবে?' হঠাৎ বলে উঠল গিলটি মিয়া।

'ওয়্যারলেসে খবর দিয়ে অন্যদের নিয়ে আসবে এখানে।'

'ডাক দিলেই এখানে পৌঁচে যাওয়া কি অতই সহজ? আর ততক্ষণ আমরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমাব? ধরা অত সহজ হবে না, স্যার।'

'একবার খুঁজে পেলে আর পিছু ছাড়বে না এরা, ধরা আমাদের পড়তেই হবে। প্রয়োজন হলে আরেকটা হেলিকপ্টারে করে লোক পাঠাবে সিলভিও। কিন্তু আর কথা নয়। এসে পড়েছে। সাবধান!'

ফিরে আসছে হেলিকপ্টারটা। সোজা এই পাহাড়ের মাথা লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে ওটা। খুব ধীরে। এ পাহাড়ের বড়জোর বিশ ফুট উপর দিয়ে উড়ে যাবে।

বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে রাস্তার ওপর দিন-দুপুরে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি ভাবতে যেমন লাগে সেইরকম একটা অনুভূতি হলো রানার মধ্যে। মনে হলো কিছুই আর অজ্ঞাত নেই পাইলটের কাছে। নিশ্চয়ই এই পাহাড়টাই ভালমত লক্ষ্য করে দেখছে এখন ও। হঠাৎ কেবিন-ডোরের সামনে দাঁড়ানো রিক্কিকে দেখতে

পেল রানা। সামনে ঝুঁকে নিচের দিকে চেয়ে রয়েছে সে।

ঠিক মাথার উপর এসে পড়ল হেলিকপ্টার। খুন করে ফেলে রাখা লাশের মত চুপচাপ শুয়ে আছে রানা ও গিলটি মিয়া চিৎ হয়ে। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে সোজা উপর দিকে।

রোটর ব্লেডের ঝোড়ো হাওয়া এসে লাগল ঝোপের গায়ে। ফাঁক হয়ে গেল পাতার ছাউনি। আনন্দে আত্মহারা হয়ে এ-ওর গায়ে লুটোপুটি খাচ্ছে ঝোপগুলো, এদিকে রানা ও গিলটি মিয়ার মাথার উপর খোলা আসমান।

রিক্কির দাগী মুখে বীভৎস নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল, পরিষ্কার দেখতে পেল রানা। পরমুহূর্তে দেখতে পেল কি যেন দাঁত দিয়ে ছিঁড়ছে রিক্কি। মুখের কাছে ডান হাত।

'গ্রেনেড!' চিৎকার করে উঠল রানা। 'গ্রেনেড ফেলছে! সাবধান!'

বিদ্যুৎবেগে পিস্তল বের করল রানা। গুলি করল। কিন্তু ঠেকানো গেল না। দ্রুত নেমে আসছে গোলমত ভয়ঙ্কর বস্তুটা।

ঝলসে উঠল তীব্র আলো। সাথে সাথেই কানে তালা লাগানো প্রচণ্ড শব্দ। রানার মনে হলো দুলে উঠল গোটা পাহাড়। পরমুহূর্তে কি যেন ছুটে এসে লাগল কপালে। চোখের সামনে দেখতে দেখতে কালো হয়ে গেল নীল আকাশ।

আট

চোখ মেলল রানা।

প্রথমে কিছুক্ষণ কিছুই দেখতে পেল না সে, তারপর দেখতে

পেল গিলটি মিয়ার উদ্বিগ্ন ফ্যাকাসে মুখ। উপুড় হয়ে ঝুঁকে রয়েছে গিলটি মিয়া ওর উপর।

'আর কোথাউ লেগেচে, স্যার?' রানাকে চোখ মেলতে দেখে খানিকটা আশ্বস্ত হলো সে।

নিজের অজান্তেই হাতটা চলে এল রানার কপালে। ভেজা! রক্ত! ধড়মড়িয়ে উঠে বসল রানা।

'নড়বেন না, স্যার!' বিচলিত হয়ে উঠল গিলটি মিয়া। 'আর কোথাউ লেগেচে?'

'না,' ধরা গলায় বলল রানা। 'কোন পাথরের টুকরো ছুটে এসে লেগেছিল মনে হচ্ছে।' হঠাৎ আকাশের দিকে চাইল। 'কোথায় গেল ওটা?'

'উই উদিক গিয়ে নেমে পড়েচে শালা। দেখাচ্চি। দাঁড়ান, আগে রক্ত পড়াটা বন্ধ করে নিই।'

রাকস্যাক থেকে ফার্স্ট-এইড কিট বের করল গিলটি মিয়া ব্যস্ত হাতে। পানির ফ্লাস্ক নিয়ে এল। কপালটা ধুয়ে পরিষ্কার করতেই সব পানি শেষ করে ফেলার উপক্রম করল গিলটি মিয়া। বারণ করল রানা।

'সব পানি শেষ কোরো না, গিলটি মিয়া। আমার তো ব্র্যাণ্ডি আছে। তুমি শেষে ছাতি ফেটে মরবে।'

'বেশি কতা বলবেন না, স্যার,' পুরো ডাক্তারী ভঙ্গি নিয়ে নিয়েছে গিলটি মিয়া। 'শেষ হয়ে গেলে কোন পাহাড়ী ঝর্ণা থেকে ভরে লিতে কতক্ষুণ?'

'পথে কোন ঝর্ণা না পড়লে?'

'আবার কতা বলে!' রেগে উঠল গিলটি মিয়া। সবটুকু পানি দিয়ে রানার কপাল ধুয়ে ফার্স্ট-এইড কিট হাতড়াচ্ছে সে। 'কি আচে? দু'পাঁচদিন পানি না খেলে মরে না মানুষ। নিন, এবার চোখ বুজে দাঁতে দাঁত কেমড়ে ধরুন।'

দুই মিনিট পর রানাকে ছেড়ে দিয়ে কয়েক পা পিছিয়ে গিয়ে গম্ভীর মুখে পরীক্ষা করল সে নিজের হাতের কাজ, তারপর হাসল সন্তুষ্ট চিত্তে।

'লেখাপড়া করলে বিরাট সিবিল সার্জেন্ট হতে পারতুম, স্যার। হাতের কাজে খুঁত পাবেন না কোন।'

ইলাস্টোপ্লাস্ট টিপে ব্যথার পরিমাণ অনুভব করবার চেষ্টা করল রানা, তারপর বলল, 'ভেরি গুড। এবার বলো দেখি কি হলো ব্যাপারটা? ভাগল কেন ব্যাটারা?'

'ভাগবে না মানে? না ভেগে উপায় আচে? ডাইভার ব্যাটা একা মানুষ, পেলেন চালাবে, না আক্রমণ করবে?'

'রিক্‌কির কি হলো?'

'ও ব্যাটা তো আপনার এক গুলিতেই শেষ। বোম ফেলার পরপরই ও-ও তো পড়েচে পেলেন থেকে। ভাগ্যিস আমার ঘাড়ে পড়েনি! পেলেনটা সরে গেচিল ততক্ষুণে। ওই দেকুন ঘাড় মটকে পড়ে আচে কি রকম।'

বিশ পঁচিশ ফুট নিচে ভাঙাচোরা বেকায়দা ভঙ্গিতে শুয়ে আছে রিক্‌কি। লাল হয়ে রয়েছে শার্টের বুক-পকেট। নিষ্প্রাণ খোলা চোখ চেয়ে আছে আকাশের দিকে নির্নিমেষে।

'আর উই যে, ওখানে নেমেচে পেলেনটা। দেকতে পাচ্চেন না? আমার আঙুল সোজা তাকান। উ…ই যে!'

দেখতে পেল রানা। প্রায় আট-দশ মাইল দূরে একটা বিচ্ছিন্ন ফার্ম-হাউসের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে রয়েছে হেলিকপ্টার। খুব সম্ভব ওখানেই আড্ডা গেড়েছে সিলভিও। খেলনার মত বাড়িটার সামনে মনে হচ্ছে কয়েকটা পিঁপড়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

বিনকিউলারটা চোখে লাগাল রানা। এক লাফে অনেক কাছে চলে এল বাড়িটা। অ্যাডজাস্টিং নব ঘুরিয়ে পরিষ্কার করে নিল রানা দৃশ্যটা। দরজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লুইসা

পিয়েত্রো। হেলিকপ্টারের দিকে চেয়ে রয়েছে সে। একটু পাশ ফিরে কপ্টারটার দিকে চাইল রানা। ওখানটায় বেশ ভিড়। হাত নেড়ে কি যেন বলছে হেলমেট পরা পাইলট। মাথা নাড়ল সিলভিও। গিয়ান এবং পপিনিকে চিনতে পারল রানা ভিড়ের মধ্যে, বাকি সবাই অচেনা। কিছু একটা প্রশ্ন করল সিলভিও। আঙুল দিয়ে সোজা রানার দিকে দেখাল পাইলট, হেলমেটটা খুলে হাতে নিল, দুই হাত একত্র করে দ্রুত ফাঁক করল কথা বলতে বলতে। রানা বুঝল গ্রেনেডের বর্ণনা হচ্ছে।

আবার মাথা নাড়ল সিলভিও। তারপর ঝট করে ফিরল গীয়ানের দিকে। সংক্ষেপে কয়েকটা আদেশ দিল সে, একবার হাত তুলে দেখাল এই পাহাড়ের দিকে, তারপর ঘুরে হাঁটতে শুরু করল বাড়িটার দিকে। ওর পিছু পিছু পাইলটও চলল বাড়ির দিকে। ব্যস্ত হয়ে উঠল বাকি কয়জন। দু'জন ছুটে গেল ফার্ম-হাউসের পাশেই আর একটা ঘরের সামনে। দরজা দু'পাট হাঁ করে খুলে ঢুকে গেল ভিতরে। কয়েক সেকেণ্ড পর বেরিয়ে এল দুটো গাড়ি। টপাটপ উঠে পড়ল সাতজন, যে যেটায় পারল। সাঁ করে গেট দিয়ে বেরিয়ে এল গাড়ি দুটো, উঁচু-নিচু পথ পেরিয়ে উঠে এল বড় রাস্তায়, তারপর দ্রুতবেগে রওনা হলো এই পাহাড়ের উদ্দেশে।

'এত কি দেকচেন, স্যার?' জিজ্ঞেস করল গিলটি মিয়া।

'রওনা হয়ে গেল ওরা।' চামড়ার খোলের ভিতর রেখে দিল রানা বিনকিউলার। ঘণ্টা দু'য়েক লাগবে ওদের এখানে পৌঁছতে। চলো এগিয়ে থাকা যাক।'

'কোতায়?'

'আপাতত ওরা যেখানটায় গাড়ি রেখে হাঁটতে শুরু করবে সেইখানে পৌঁছতে হবে আমাদের।'

'এই জকম নিয়ে পারবেন অতটা হাঁটতে?'

'পারতেই হবে। এছাড়া আর কোন উপায় নেই। ধরা পড়লে হাটুরে কিল খেয়ে মরতে হবে। নয়জন আসছে ওরা। চলো নামতে শুরু করি।'

পাহাড় থেকে নিচে নামতে লাগল দশ মিনিট। এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে জমির উপর দিয়ে এগোল ওরা পশ্চিম দিকে, ফার্ম-হাউসটা লক্ষ্য করে। মন্থর গতিতে এগোচ্ছে ওরা ঝোপ-ঝাড় আর পাথরের চাঁই এড়িয়ে। আধঘণ্টা একটানা হেঁটে টের পেল রানা কী অসাধ্য সাধনে লেগেছে সে। মাথাটা ঘুরছে। আর কতক্ষণ লাগবে বড় রাস্তায় পৌঁছতে কে জানে! এভাবে আর বেশিক্ষণ হাঁটা সম্ভব নয় ওর পক্ষে।

খাড়াই বেয়ে উপরে উঠলে দেখা যায় ফার্ম-হাউসটা, নিচে নামলে অদৃশ্য হয়ে যায়। দূরত্ব এখন সাত মাইল। রাস্তার বেশ কাছাকাছি এসে গেছে ওরা নিশ্চয়ই, এবার ধীরে ধীরে বামদিকে এগোনো দরকার। আরও আধঘণ্টা চলবার পর আবার একটা খাড়াই বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা। খুবই সতর্কতার সাথে এগোচ্ছে ওরা এখন, মাঝে মাঝেই থেমে দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে শুনবার চেষ্টা করছে গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ। উঁচু জায়গায় এসে রাস্তা দেখতে পেল রানা, কিন্তু ঢাল বেয়ে নামতে গিয়েই ঝপ করে বসে পড়ল।

বাম পাশে পাহাড়ের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে দুটো গাড়ি। পাহাড়ের গা বেয়ে উপরে উঠে যাচ্ছে সাত-আটজন লোক। ঘুরপথে না এসে সরাসরি এলে ঠিক ওদের মুখোমুখি পড়ত ওরা।

গীয়ানকে দেখা গেল বসে আছে গাড়ির কাছে। পাহারা দিচ্ছে।

'আড়ালে আড়ালে নেমে যেতে হবে আমাদের।' চাপা গলায় বলল রানা। 'আগে এই ব্যাটারা পাহাড় ডিঙিয়ে নিচে নামতে শুরু করুক, তারপর। একটা গাড়ি অকেজো করে দিতে হবে। তার

আগে কাবু করতে হবে গীয়ানকে। কিন্তু বেশিদূর তো নামা যাবে না এই ঢাল বেয়ে। শেষের তিরিশ গজ একেবারে ফাঁকা, একটা ঝোপ নেই। একবার পিছন ফিরে চাইলেই...'

'গুলি খাবে, আবার কি?' বলল গিলটি মিয়া। 'এই মোটা মরলে আমাদের কোন ক্ষতি আচে?'

'আওয়াজ হবে। ফিরে আসবে ওই ব্যাটারা কি হলো দেখতে।'

'ততক্ষণে আমরা ভাগলওয়া!' হাসল গিলটি মিয়া। 'আমাদের অত তাড়াহুড়ো কিসের? যাক না ব্যাটারা দুটো পাহাড় ডিঙিয়ে, তারপর জিরিয়ে-টিরিয়ে নিয়ে নামব আমরা ধীরে-সুস্তে।'

কথাটা ঠিক। রাজি হয়ে গেল রানা।

পাশের পাহাড়ের মাথায় উঠেই বসে পড়ল পপিনি। ঝোপের আড়ালে আরও একটু ভাল করে গা ঢাকা দিল রানা ও গিলটি মিয়া। এখান থেকে গজ পঞ্চাশেক হবে। আরও একজন উঠল চূড়ায়। বিরক্ত ভঙ্গিতে থুতু ফেলল পপিনি।

'এত লোক একসাথে কষ্ট করে কোন লাভ আছে?' বলল পপিনি। 'পাইলট বলল তিনজনই মারা গেছে একসাথে। নিজের চোখে দেখেছে সে। তার পরেও এত লোক লস্কর নিয়ে যাওয়ার কি মানে হয়? অর্ধেক আমরা থেকে গেলেই তো পারি, বাকি অর্ধেক যাক, নিয়ে আসুক লাল খাতাটা।'

'বাজে বোকো না পপিনি,' বকা দিল দ্বিতীয় লোকটা। 'চীফ সাবধান হতে বলে দিয়েছে গীয়ানকে। মারা না-ও গিয়ে থাকতে পারে। ওই লোকটা খুবই নাকি ভয়ঙ্কর, ঘোল খাইয়ে ছেড়ে দিয়েছে আমাদের ভেনিসে। চলো, নামা যাক। উফ্, আরও পাঁচটা পাহাড় ডিঙাতে হবে।'

নামতে শুরু করল লোকটা। গজর গজর করতে করতে চলল পপিনিও। বাকি সবাই একে একে এসে পৌঁছল এবং নেমে গেল

নিচে।

'চলুন, স্যার, নিচের ওই সবশেষের ঝোপটার আড়ালে গিয়ে বিশ্রাম নেয়া যাক আদ-ঘণ্টা।'

অতি সন্তর্পণে, হাত বা পায়ের ধাক্কায় একটি পাথর না খসিয়ে নেমে এল ওরা আড়াইশো গজ ঝোপ-ঝাড় আর পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে আড়ালে। একটা বোল্ডারের উপর পাশ ফিরে বসে হাওয়া খাচ্ছে গীয়ান। কালো স্যুট আর কালো হ্যাট পরনে। একটা সিগারেট ধরিয়ে টানছে আনমনে।

মনে মনে হিসেব করল রানা। নিঃশব্দে যদি কাজ সারা সম্ভব হয়, তাহলে আর দেরি করবার কোন মানে হয় না। কিন্তু গুলি যদি করতেই হয়, এবং ওরা যদি কারণ অনুসন্ধান করতে আসেও, সবাই আসবে না। বড়জোর একজন বা দু'জনকে পাঠাবে। তাদেরও গাড়ির কাছে পৌঁছতে লাগবে কমপক্ষে ঝাড়া বিশ মিনিট। ততক্ষণে একটা গাড়ি অকেজো করে দিতে পারবে ও অনায়াসে। অপরটাতে চড়ে রওনা হবে ওরা ফার্ম-হাউসের দিকে। তারপর, যদি হেলিকপ্টারটা দখল করতে পারে...

অস্থির হয়ে উঠল রানা দশ মিনিটের মধ্যেই। প্রতীক্ষা করতে ওর ভাল লাগে না কোনদিনই। তার উপর গীয়ানের সিগারেট খাওয়া দেখে এবং ধোঁয়ার গন্ধে সিগারেটের তেষ্টা পেয়ে গেল ওর ভয়ানক। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে।

'আমি চললাম, গিলটি মিয়া। তুমি এখানটাতেই থাকো। কাছাকাছি গিয়ে আমি যখন হাত তুলব, তখন একটা ঢিল মেরে ওর মনোযোগ অন্যদিকে ফেরাবার চেষ্টা করো। শেষের দশ গজ ধাওয়া করে পৌঁছতে হবে ওর কাছে।'

গিলটি মিয়া বুঝল প্ল্যান কিছুটা পরিবর্তন করছে রানা। মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হয়ে গেল।

রওনা হতে যাবে রানা, ঠিক এমনি সময় উঠে দাঁড়াল

গীয়ান। পায়চারি শুরু করল গাড়ির পাশে। মাঝে মাঝে ভ্রূ কুঁচকে পাহাড়ের দিকে দেখছে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই দ্বিতীয় পাহাড়টায় চড়তে শুরু করেছে ওরা। খানিক বাদেই দেখা যাবে ওদের। এখনও কেন দেখা যাচ্ছে না, কেন আরও দ্রুত পা চালাচ্ছে না সবাই, সেটা ভেবে নিরতিশয় বিরক্ত হচ্ছে গীয়ান। অকম্মার ঢেঁকি, খেয়ে খেয়ে খোদাই ষাঁড় হয়ে গেছে, কুঁড়ের বাদশা সব, ইত্যাদি যা নয় তাই বলে গাল দিল সে কিছুক্ষণ ওদের, অস্থির পায়ে পায়চারি করল, বার বার পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, তারপর আবার গিয়ে বসল পাথরটার উপর। সিগারেট ধরাল আরেকটা।

রাকস্যাকটা খুলে রেখে ক্রলিং শুরু করল রানা। দ্রুত নিঃশব্দে নেমে যাচ্ছে নিচে। থামছে। দু'একটা বিচ্ছিন্ন ঝোপের আড়ালে, বা বিক্ষিপ্ত পাথরের আড়ালে থেমে দেখে নিচ্ছে গীয়ানের মতিগতি। আবার নামছে। মনে হচ্ছে প্রকাণ্ড এক লেজ-কাটা টিকটিকি এগিয়ে যাচ্ছে শিকারের দিকে।

দশ গজের মধ্যে পৌঁছে গেল রানা। দৌড় প্রতিযোগিতার ভঙ্গিতে প্রস্তুত হলো সে- বাম পা সামনে, হাত দুটো মাটিতে। একটা হাত চট করে একবার উঁচু করেই নামিয়ে নিল।

গুলি করল গিলটি মিয়া। খটাং করে গাড়ির গায়ে লেগে ছিটকে এসে পড়ল মার্বেলটা গীয়ানের পায়ের কাছে। চমকে গাড়ির দিকে চেয়েছিল গীয়ান, এখন অবাক চোখে দেখছে গুলিটা, পরমুহূর্তে উঠে দাঁড়াল বিপদ টের পেয়ে।

কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে অনেক। প্রকাণ্ড এক লাফ দিয়ে ওর ঘাড়ের উপর পড়ল রানা। টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেল গীয়ান, রানা পড়ল ওর উপর। চার হাত-পা চলছে রানার সমানে।

রানার রাকস্যাকটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে দৌড়ে নেমে এল

গিলটি মিয়া। কিন্তু সাহায্যের প্রয়োজন হলো না। ততক্ষণে পা ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনছে রানা গীয়ানের জ্ঞানহীন দেহটা বোল্ডারের আড়ালে।

'উঠে পড়ো, গিলটি মিয়া,' বলল রানা। 'লাল গাড়িটায়।'

কালো গাড়িটার এঞ্জিনের বনেট খুলে ফেলল রানা, ডিস্ট্রিবিউটার ক্যাপটা খুলে হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে নিয়ে এল দু'তিনটে তারসহ, মাটিতে ফেলে পা দিয়ে চেপে চুর করে দিল সেটা। বনেট নামিয়ে কি মনে করে গীয়ানের হ্যাটটা টান দিয়ে খুলে মাথায় পরল, তারপর গিয়ে বসল লাল গাড়ির ড্রাইভিং সীটে।

বহুদূর থেকে একটা চিৎকারের শব্দ ভেসে এল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রানা, দ্বিতীয় পাহাড়ের চুড়োয় দাঁড়িয়ে আর সবাইকে ডেকে রাস্তার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে দু'জন লোক। দেখে ফেলেছে ওরা রানা ও গিলটি মিয়াকে। নেমে আসতে শুরু করল এবার।

এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে হাসল রানা। সিগারেট ধরাল একটা।

'আজ আর আমাদের ধরতে হচ্ছে না। ফার্ম-হাউসে পৌঁছতে ওদের লাগবে পাক্কা আড়াই ঘণ্টা।'

রওনা হলো ওরা। মাইল খানেক গিয়ে ভাল রাস্তায় পড়ল। বাঁক নিয়েই তুফান বেগে ছুটল ফার্ম-হাউসের দিকে। কাছাকাছি গিয়ে গতি একটু কমাল রানা।

'সীট ছেড়ে নিচে নেমে বসো, গিলটি মিয়া। আমাকে দেখে ওরা মনে করবে গীয়ান ফিরছে রিপোর্ট করতে। অপ্রস্তুত অবস্থায় পাব ওদের আশা করছি।'

একগাল হেসে সীট ছেড়ে নেমে গেল গিলটি মিয়া। পিস্তলটা বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে। মাইল খানেক গিয়ে বাঁয়ে মোড় নিল রানা। টুপিটা টেনে মুখের অর্ধেকটা ঢেকে দিয়েছে সে আগেই।

'পৌঁছে গিয়েছি, গিলটি মিয়া। তুমি যেমন আছ তেমনি বসে থাকবে। আমি আগে ঢুকব বাড়ির ভিতর। পাঁচ মিনিট পর ঢুকবে তুমি। আমার কোন বিপদ হলে তুমি সাহায্য করতে পারবে। দু'জনে একসাথে বিপদে পড়া ঠিক হবে না।'

'ঠিক আচে। পাঁচ মিলিট পরেই বেরোব আমি নাহায়।'

একবার ইচ্ছে করল রানার, সোজা গিয়ে হেলিকপ্টারে ওঠে। কাছেই মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ওটা চুপচাপ। কিন্তু ইচ্ছেটা দমন করল সে। আগে এ বাড়িতে যারা আছে তাদের কাবু করে নিতে হবে।

বাড়ির সামনে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। বাম হাতে স্টিয়ারিং হুইল ধরে আছে রানা, ডানহাতে ওর ওয়ালথার পি. পি. কে। নিচু করে রেখেছে হাতটা।

ঘ্যাচ করে ব্রেক করল রানা। তিন লাফে পেরিয়ে গেল সামনের ছোট বাগানটা।

রানা আশা করেছিল গীয়ানকে ফিরতে দেখে দরজার কাছে এসে দাঁড়াবে সিলভিও বা আর কেউ। কিন্তু কেউ এল না। বন্ধ দরজায় কান পাতল রানা। কারও পায়ের শব্দও পাওয়া যাচ্ছে না। বুঝল প্রথম চালটা ওকেই চালতে হবে।

হ্যাণ্ডেলে চাপ দিয়ে ঠেলা দিতেই ক্যাঁচম্যাচ শব্দে খুলে গেল দরজাটা। হলরুম। ঢুকে পড়ল রানা। সামনেই দোতলায় ওঠার সিঁড়ি, ডানপাশে একটা বন্ধ দরজা, সিঁড়ির পাশ দিয়ে একটা প্যাসেজ।

আধ সেকেণ্ডের বেশি এসব দেখার সুযোগ পেল না রানা, কারণ ওর চোখ পড়ল হেলিকপ্টারের পাইলটের উপর। সিঁড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে নেমে আসছিল লোকটা, রানাকে দেখে জমে গেছে মূর্তির মত। হাঁ হয়ে গেছে ওর মুখটা, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর ছেড়ে। যেন ভূত দেখতে পেয়েছে

সামনে।

'টুঁ শব্দ করলেই মারা পড়বে!' বলল রানা চাপা গলায়।

পিস্তলটার দিকে চোখ পড়তেই হাত দুটো তুলে ফেলল সে মাথার উপর। রক্তশূন্য মুখ। ডান গালটা লাফাচ্ছে আপনাআপনি।

'নেমে এসো!' আদেশ করল রানা।

ঠিক যেন একরাশ ডিমের উপর দিয়ে হাঁটছে এমনি সন্তর্পণে রানাকে বিন্দুমাত্র না চটিয়ে নেমে এল পাইলট।

'ঘুরে দাঁড়াও,' আবার হুকুম করল রানা।

কান্নার ভঙ্গিতে বিকৃত হয়ে গেল লোকটার মুখের চেহারা। ওর স্থির বিশ্বাস, ঘুরলেই গুলি করবে রানা। কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, রানার হাতের পিস্তলটা একটু নড়ে উঠতেই চোখ বুজে ঘুরে দাঁড়াল। লোকটাকে সার্চ করে দেখা গেল কোন অস্ত্র নেই ওর কাছে। তিন পা পিছিয়ে গেল রানা আবার।

'আর সবাই কোথায়?'

প্যাসেজের শেষের দিকে একটা বন্ধ দরজার দিকে আবছা ইঙ্গিত করল লোকটা।

'হাঁটো। কৌশল করতে গেলেই গুলি খাবে।'

এগোল পাইলট। প্যাসেজ ধরে কিছুদূর এগিয়ে বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, হ্যাণ্ডেল ধরে চাপ দিয়ে খুলল দরজাটা, এবং পিছন থেকে রানার হাতের প্রচণ্ড এক ধাক্কায় হুমড়ি খেয়ে চার হাত-পায়ে ভর করে পড়ল গিয়ে চেয়ারে বসা সিলভিওর পায়ের কাছে।

'খবরদার, কেউ নড়বে না!' ঘরের ভিতর এক পা ঢুকে এসে বলল রানা।

চমকে উঠল লুইসা পিয়েত্রো। জানালার ধারে বসে ব্যস্ত হাতে উল বুনছিল, থেমে গেল হাত। ঝট করে ফিরল রানার দিকে।

উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখ দুটো।

'রানা। বেঁচে আছ তুমি!'

নিবিষ্টচিত্তে একটা ম্যাপ দেখছিল সিলভিও। জ্যান্ত, পিস্তলধারী রানাকে চোখের সামনে দেখে ফ্যাকাসে হয়ে গেল মুখটা। হাত থেকে খসে পড়ে গেল ম্যাপ। ঢোক গিলল বার দুই।

'কি? ভাবতে পারোনি গ্রেনেড খেয়েও এখানে এসে হাজির হতে পারি, তাই না?' হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল রানা সিলভিওকে। 'মৃত্যু-ভয় আসছে, সিলভিও?'

'গ্রেনেড?' তাজ্জব হয়ে গেল লুইসা। 'গ্রেনেড ছুঁড়েছিল ওরা তোমার ওপর? তাই কপালটা কাটা দেখছি?' তীব্রদৃষ্টিতে চাইল লুইসা সিলভিওর দিকে। 'সিলভিও। তুমি হুকুম দিয়েছিলে গ্রেনেড ছোঁড়ার? কি কথা দিয়েছিলে তুমি আমাকে?'

'চুপ করো লুইসা,' ধমকে উঠল সিলভিও। 'পুরুষ মানুষের কথার মধ্যে কথা বলোনা।'

'পুরুষ, না কাপুরুষ?' ফোঁস করে উঠল লুইসা।

লুইসার কথায় কর্ণপাত না করে রানার দিকে ফিরল সিলভিও।

'আপনার সাথে কথা আছে আমার। আপনি এদেশ থেকে বোরোতে পারবেন না। প্রত্যেকটা রাস্তায় পাহারা বসেছে। পুলিস খুঁজছে আপনাকে হন্যে হয়ে, প্রত্যেকটা বর্ডার টাউনে স্পেশাল গার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজ হোক বা কাল হোক, ধরা আপনাকে পড়তেই হবে। আমার সাথে যদি একটা সমঝোতায় আসেন...'

'তোমাকে সমঝে নিয়েছি, আর কোনরকম সমঝোতায় আসার বিন্দুমাত্র আগ্রহ আমার নেই।'

'বইটা ফেরত দিয়ে দিন, সিনর মাসুদ রানা। যত টাকা চান,

কিনে নেব ওটা আমি আপনার কাছ থেকে।'

'টাকার চেয়েও বড় দু'একটা জিনিস এখনও এই পৃথিবীতে আছে, সিলভিও। নোট বইটা পাচ্ছ না তুমি, কাজেই ও-নিয়ে বাজে বকে লাভ নেই।'

'কুনো অসুবিদে নেই তো, স্যার?' দরজার বাইরে থেকে জিজ্ঞেস করল গিলটি মিয়া। 'সব ঠিকঠাক?'

'এখানে কোন গোলমাল নেই,' সিলভিওর উপর থেকে চোখ না সরিয়েই জবাব দিল রানা। 'কিন্তু বাড়িতে আর কেউ আছে কিনা দেখার সুযোগ পাইনি। তুমি একপাক ঘুরে দেখো। যদি কাউকে দেখতে পাও, একবার প্যাঁচার ডাক ডেকে তাকে বন্দী করে নিয়ে আসবে এখানে। আর যদি বিপদে পড়ো, দু'বার ডাকবে ডাকটা। বুঝতে পেরেছ?'

'নিচ্চয়। চললুম, স্যার।'

'আর একটা কথা। শক্ত দড়ি পেলে নিয়ে এসো খানিকটা।'

'পেয়ে যাব, স্যার। আমি থাকতে কোন চিন্তা নেই আপনার।'

পাইলটটা জড়োসড়ো ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে একবার রানা আর একবার সিলভিওর মুখের দিকে চাইছে। কোন্‌জন বেশি ভয়ঙ্কর বুঝে উঠতে পারছে না বোধহয়।

'কান পেতে রানার মুখে বাংলা কথা শুনছিল লুইসা, বলল, 'বড় মিষ্টি ভাষা তো! যাই হোক, এখন কি করবে আমাদের? মেরে ফেলবে?'

'বেঁধে রেখে চলে যাব। তোমাদের লোকজন এসে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে, খুলে দেবে ওরা।'

'কিন্তু তাহলে পালাবে কি করে?'

'হেলিকপ্টারটা নিয়ে উড়ে চলে যাব।'

মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল সিলভিওর মুখ। বলল, 'গুল মারছ! চালাতে পারবে না তুমি ওটা।'

'সেটা নিজের চোখেই দেখতে পাবে।'

'কিন্তু এদের তুমি চেনো না রানা,' বলল লুইসা। 'এরা বড় ভয়ঙ্কর। করতে পারে না এমন কাজ নেই। যতদিন বেঁচে থাকবে মৃত্যু-পরোয়ানা ঝুলবে তোমার মাথার ওপর। তার চেয়ে নোট বইটা দিয়ে দিলে ভাল হত না? তোমার নিজের দেশের ব্যাপার তো নয় এটা। আমি তোমার ভালর জন্যেই বলছি, রানা। দিয়ে দাও ওটা, প্লীজ!'

'আমার মঙ্গল কামনার জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ, লুইসা। কিন্তু বহু দস্যুদলের বহু মৃত্যু পরোয়ানা এখনও ঝুলছে আমার মাথার ওপর, সুযোগ পেলে তারাও ছাড়বে না আমাকে। কিন্তু ওসব পরোয়া করি না। করলে ইঁদুরের গর্তে লুকিয়ে থাকতাম। নোটবইটা ফেরত দেয়ার প্রশ্নই ওঠে না।'

'কিন্তু তুমি এক বিদেশী গুপ্তচর, ওটা ভারতে পৌঁছে দিলে তোমার কি লাভ, রানা?'

'তোমাদের কি ক্ষতি শুনি?'

'পিয়েত্রো গ্লাস ফ্যাক্টরির নাম মুছে যাবে পৃথিবী থেকে। শুধু ভারতেই নয়, গোটা ইউরোপ জুড়ে যে বিরাট ব্যবসা গড়ে উঠেছে গত দশ বছর ধরে, ধূলিসাৎ হয়ে যাবে সেটা। নোট বইটা উদ্ধার করতে না পারলে দল থেকে বের করে দেয়া হবে সিলভিওকে।'

কিছুতেই হাসি সংবরণ করতে পারল না রানা। হেসে উঠে বলল, 'ছেলেমানুষের মত কথা বলছ, লুইসা। তোমাদের কাছে ব্যাপারটা যতখানি গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে, আমার কাছে মোটেই তা মনে হচ্ছে না। দশ বছর ধরে বে-আইনী ব্যবসা করে অঢেল টাকা করেছ তোমরা, এখন এ ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেলে তোমরা পথে বসবে না। আর দল থেকে যদি সিলভিওকে বের করে দেয়, সেটা ওর জন্যে শাপে বর হবে। মহা বাঁচা বেঁচে যাবে ও। কাজেই আমি তোমাদের কোন ক্ষতি দেখতে পাচ্ছি না। শুধু

দেখতে পাচ্ছি টাকা আর ক্ষমতার লোভে তোমরা কত নিচে নামতে পারো। জুলি মাযিনিকে খুন করতে বাধেনি তোমাদের, অনিলকে খুন করতে বাধেনি, জবাই করেছ তোমরা স্টেফানো মন্টিনির মত একজন মহৎপ্রাণ আত্মভোলা স্পোর্টসম্যানকে, এখান পর্যন্ত তেড়ে এসেছ আমাদের দু'জনকে খুন করতে। যাবার আগে তোমাদের এই মেয়েলী চেহারার মেনীমুখো ভাইটার বুকের ভেতর একটা বুলেট ঢুকিয়ে দিয়ে যেতে পারলে আমি খুশি হতাম। কিন্তু একজন অসহায় নিরস্ত্র, পরাজিত লোককে হত্যা করতে বাধছে আমার। কিন্তু তোমাদের তো বাধেনি? বিশেষ করে তুমি কি করে এই নির্বিচার হত্যাকাণ্ড সমর্থন করলে, ভাবতে অবাক লাগছে। এতকিছুর পরেও কি করে ওকালতী করছ ভাইয়ের হয়ে? তোমার প্রতি আমার দুর্বলতা আছে, কিন্তু তাই বলে তোমার অন্যায় আবদার রক্ষা করব, তা ভেবো না। কিছুতেই দেব না আমি এ নোটবই।'

রানার তীক্ষ্ণ তিরস্কারে স্তব্ধ হয়ে গেল লুইসা। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখটা। কয়েক সেকেণ্ড কোন জবাব খুঁজে পেল না, তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল, 'খুন-খারাপীর পেছনে কোনদিনই আমার সমর্থন ছিল না। এখনও নেই। তোমার বন্ধুর মৃত্যুতে আমি সত্যিই দুঃখিত।'

গিলটি মিয়া তার কামান হাতে ঢুকল ঘরে। অপর হাতে একগোছা পাকানো দড়ি।

'কেউ নেই, স্যার। একেবারে ফাঁকা।'

'ঠিক আছে। এবার বেঁধে ফেলো সব ক'টাকে। জলদি।'

পাইলট কোন আপত্তিই করল না, কিন্তু সিলভিওর দিকে এগোতেই এক লাফে চেয়ার ছেড়ে উঠে কণ্ঠনালী টিপে ধরল সে গিলটি মিয়ার। এরকম একটা ঘটনার জন্যে প্রস্তুত ছিল রানা। বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে এল সে, বাম হাতে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল

সিলভিওর থুতনির নিচে। চোখ কপালে উঠল সিলভিওর, হাত ছুটে গেল কণ্ঠনালী থেকে, শরীরটা ঘুরে গেল একটু। ধাঁই করে পিস্তলের বাঁট পড়ল সিলভিওর মাথায়। ধড়াস করে পড়ল মেঝেতে জ্ঞান হারিয়ে।

'এবার বাঁধো।' হুকুম করল রানা।

প্রেমিক রানার এই ভয়ঙ্কর রূপ বোধহয় স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি লুইসা। ওর আক্রমণের ক্ষিপ্রতা আর প্রচণ্ডতা এক সেকেণ্ডের জন্যে বিহ্বল করে দিল ওকে। নিজের ভাইয়ের উপর আঘাত পড়তে দেখে সহ্য করতে পারল না, ঝট করে মুখ ফিরাল জানালা দিয়ে বাইরে, পরমুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে গেল।

এই হঠাৎ আড়ষ্টতা নজর এড়াল না রানার। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিল, এমনি সময় বাইরের দিকে চেয়েই কথা বলে উঠল লুইসা। কণ্ঠস্বরটা ভাবলেশহীন।

'তোমার একটু তাড়াতাড়ি করা দরকার রানা। ফিরে আসছে ওরা।'

দ্রুতপায়ে জানালার ধারে এসে দাঁড়াল রানা। দেখা গেল সত্যিই একটা ছাত খোলা গাড়ি আসছে এইদিকে ধুলো উড়িয়ে। অত্যন্ত দ্রুত এগিয়ে আসছে ওটা।

সিলভিওকে বাঁধা শেষ করে এইদিকে এগিয়ে আসছিল গিলটি মিয়া। রানার একটা বাহু ধরল লুইসা।

'আমি তোমার হাতে বন্দী হতে চাই, রানা।'

'তোমাকে বন্দী করতে চাই না আমি, লুইসা।'

'বাঁধবে না আমাকে?'

'না। কোন বাঁধনেই বাঁধব না। তুমি মুক্ত।'

ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল রানা ও গিলটি মিয়া।

হেলিকপ্টারে উঠে বাইরে মুখ বের করে দেখল রানা তীব্রবেগে ছুটে আসছে হুড খোলা গাড়িটা। ভিতরে ছয়জন যাত্রী।

অনেক কাছে চলে এসেছে। খুব সম্ভব বড় রাস্তায় এটাকে থামিয়ে দখল করে নিয়েছে ওরা।

ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে চালু করল রানা এঞ্জিন। পিচ কন্ট্রোলের থ্রটল ঘুরিয়ে চালু করল রোটর ব্লেড।

মাথা বের করে গাড়িটা দেখল গিলটি মিয়া। ফার্ম-হাউসের গেট দিয়ে ঢুকছে এখন ওটা। গুলি করল গিলটি মিয়া। মুহূর্তে চুর হয়ে ফেটে ঝাপসা হয়ে গেল গাড়ির উইণ্ডস্ক্রীন। প্রাণপণে ব্রেক চাপল ড্রাইভার, কয়েক ফুট স্কিড করে এগিয়ে থেমে গেল গাড়িটা।

ডোবার ব্যাঙের মত লাফ দিয়ে নামল ছয়জন গাড়ি থেকে। পজিশন নিল যে যেখানে পারল।

হুইল ব্রেক ছেড়ে পিচ লিভারটা উপরে টানল রানা। ধীরে ধীরে শূন্যে উঠে যাচ্ছে হেলিকপ্টার।

গুলি করতে শুরু করল ওরা। গিলটি মিয়ার কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল একটা গুলি। আরেকটা গিয়ে ঢুকল প্যানেলের গায়ে বসানো ঘড়ির মধ্যে। একজন টেকো লোকের কপালে সুপুরীর সমান ঢেলা তুলে দিল গিলটি মিয়া গুলি করে। কিন্তু তৃতীয় গুলির আর সুযোগ পাওয়া গেল না।

জয়স্টিকটা সামনে ঠেলে দিয়েছে রানা, আরও খানিকটা থ্রটল দিয়ে রাডার পেডালে রেখেছে বাম পা। কোণাকুণি ভাবে উঠে গেল হেলিকপ্টার। তিন সেকেণ্ডেই ফার্ম-হাউসের আড়ালে পড়ে গেল ওরা ছয়জন।

উত্তর-পশ্চিম কোণে হারিয়ে গেল হেলিকপ্টার ছোট হতে হতে বিন্দু হয়ে গিয়ে।

নয়

রানার পাশের সীটে বসে খুশি মনে পর্বতমালা দেখতে দেখতে চলেছে গিলটি মিয়া। আনন্দ আর ধরে রাখতে পারছে না সে। শেষকালে বলেই ফেলল, 'উফ্! এইসব পাহাড়-পব্বত ডিঙিয়ে যদি হেঁটে যেতে হত, এক্কেবারে ফিনিশ হয়ে যেতুম, স্যার। ভাগ্যিস এটার ডাইবারীটা শিকে রেকেছিলেন, তাই রক্ষে!' আবার একচোট হেসে নিয়ে বলল, 'শালাদের এমন ক্যাচকলা দেকিয়ে দিয়েচেন, তিন পুরুষেও ভুলতে পারবে না। তবে মেয়েটাকে আমার তত খারাপ মনে হয়নিকো। কিন্তুক ওর ভাইটা, ওটা একটা...'

'অত খুশি হওয়ার কিছু নেই, গিলটি মিয়া,' বলল রানা মৃদু হেসে। 'খানিক বাদেই নামতে হবে আমাদের!'

'কেন? লণ্ডন-প্যারিস যাচ্চি না আমরা এটায় চড়ে?'

'তেল নেই,' সোজা সাপ্টা জবাব দিল রানা। 'আর দশ মিনিটের মধ্যেই নামতে হবে আমাদের। বর্ডারটাও পার হওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।'

'তার মানে আবার হাঁটতে হবে?' আঁতকে উঠল গিলটি মিয়া।

মাথা ঝাঁকাল রানা।

খানিকক্ষণ মন-মরা হয়ে বসে রইল গিলটি মিয়া, কিন্তু আবার খুশি হয়ে উঠতেও সময় লাগল না ওর।

'কিন্তুক, যাই বলুন, বড় জবর ঘোল খাওয়ানো গেচে

শালাদের। ওরা মনে করবে আমরা নাগালের বাইরে চলে গেচি।'

'উঁহুঁ।' মাথা নাড়ল রানা। 'ওরা জানে বেশিদূর যেতে পারব না আমরা এটায় করে। পাইলট বলে দেবে যে তেল নেই এতে।'

'তাহালে তো মুশকিল! আবার তাড়া খাওয়া নেড়ি কুত্তার মত ভেগে বেড়াতে হবে। তা এখুন আমরা চলেচি কোন্‌দিকে?'

'বর্ডারের দিকে। ওখানে কড়া পাহারা রয়েছে। যে করে হোক ওদের চোখে ধুলো দিয়ে ঢুকে পড়তে হবে আমাদের সুইট্‌জারল্যাণ্ডের ভেতর। একবার ওখানে পৌঁছতে পারলে ট্রেনে করে চলে যাব আমরা জুরিখ। সেখান থেকে লণ্ডনের প্লেন ধরা কষ্টকর হবে না। কিন্তু তেলের যা অবস্থা তাতে বর্ডার পর্যন্ত পৌঁছোনো যাবে বলে তো মনে হয় না।'

ফুয়েল গজের দিকে চেয়ে ভ্রূ কুঁচকে উঠল রানার। প্রায় জিরোতে গিয়ে ঠেকেছে কাঁটা। একটা ছোট চৌকোণ জায়গায় বার বার লাল বাতি জ্বলে উঠে বিপদ সঙ্কেত জানাচ্ছিল, এখন আর নিভছে না সেটা, জ্বলে রয়েছে সারাক্ষণ। আগামী তিন চার মিনিটের মধ্যেই একেবারে খালি হয়ে যাবে পেটস্‌ল ট্যাংক।

'এদিক ওদিক একটু খুঁজে দেখো তো গিলটি মিয়া, প্যারাসুট পাওয়া যায় কিনা।'

'মরি মরব, কিন্তুক আমি এত ওপর থেকে ঝাঁপ দিতে পারব না, স্যার। অসম্ভব। আপনার জন্যে খুঁজে দেখতে পারি...'

উঠতে যাচ্ছিল গিলটি মিয়া, বারণ করল রানা।

'থাক। তাহলে আর দরকার নেই,' খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে আঙুল তুলে দেখাল। 'ওই দেখো টিরানো শহর। ওই পর্যন্ত পৌঁছতে পারব না আমরা। কিন্তু এখন এখানে নামাও নিরাপদ নয়, ফেরারও উপায় নেই।'

হঠাৎ বুদ্ধি খেলল রানার মাথায়, 'আরে! গর্দভ আমি একটা! রিজার্ভ ট্যাংক তো দেখিনি। ওখানে কিছু পেটস্‌ল থাকতে পারে।

নাকি রিজার্ভ ট্যাংকের তেলেই চলছি আমরা?'

একটা বোতাম টিপল রানা। পরমুহূর্তে হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। সামান্য একটু উঁচু হয়ে গেল ফুয়েল গজের কাঁটা। লাল বাতিটা সর্বক্ষণ না জ্বলে বিপদ সঙ্কেত জানাতে শুরু করল আবার থেকে থেকে। রানার মুখে হাসি দেখে জোরে হেসে উঠল গিলটি মিয়া কিছু না বুঝেই। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'হাসছেন যে, স্যার?'

'তুমি হাসছ কেন?'

'আপনাকে হাসতে দেখলে আমার খুব খুশি লাগে, স্যার। তাইতে হাসচি।' পরিষ্কার উত্তর গিলটি মিয়ার। রানা জানে, এতটুকু মিথ্যে নেই ওর কথায়। আশ্চর্য এক মায়া-জালে জড়িয়ে গেছে গিলটি মিয়া ওর সাথে, চেষ্টা করেও দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি সে ওকে। 'গোমড়ামুকো লোক আমার পচোন্দ হয় না, স্যার। কই, বললেন না, হাসচেন কেন?'

'আরও দশ মিনিটের পেটস্‌ল পাওয়া গেছে। টিরানোতে না নেমে আর একটু ভেতরে গিয়ে নামতে পারব এবার আমরা।' উঁচুতে উঠতে শুরু করেছে হেলিকপ্টার। 'পর্বত ডিঙিয়ে আমরা সমতল জায়গায় নামার চেষ্টা করব। ম্যাপটা বের করো দেখি?'

সুইস বর্ডারের তুষার ঢাকা পর্বত-শৃঙ্গের পঞ্চাশ ফুট উপর দিয়ে টপকে চলে এল ওরা এপারে। ম্যাপ দেখে মোটামুটি পছন্দসই জায়গা বের করে ফেলল রানা। সাত মিনিট পর মেঘ ফুঁড়ে নেমে এল ওরা ছাগল-চরা একটা সবুজ মাঠে। কাছাকাছিই রাস্তা দেখা যাচ্ছে একটা।

'লোকজন জড়ো হওয়ার আগেই ঝটপট নেমে পড়ো, গিলটি মিয়া। জবাবদিহি করতে গেলে দেরি হয়ে যাবে।'

হেলিকপ্টার থেকে নেমে প্রায় দৌড়ে উঠে এল ওরা রাস্তায়। হাঁটতে শুরু করল দ্রুতপায়ে। মাইল তিনেক হাঁটার পর

অপেক্ষাকৃত ধীর করল হাঁটার গতি। আরও কিছুক্ষণ চলার পর পেছনে এঞ্জিনের শব্দ শুনতে পেল রানা।

'গাড়ি আসছে, দেখা যাক লিফট পাওয়া যায় কিনা।'

পাঁচ মিনিট পর দেখা গেল মস্ত এক ট্র্যাক আসছে। কাছে আসতেই হাত তুলে থামবার ইঙ্গিত করল রানা। থেমে দাঁড়াল ট্র্যাক, জানালা দিয়ে গোলগাল হাসি-খুশি মুখ বের করে মাথা ঝাঁকাল ড্রাইভার।

'সেন্ট মরিয পর্যন্ত লিফট দিতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'উঠে পড়ো।' পাশের দরজাটা খুলে দিল ড্রাইভার।

ওই পাহাড়ের ধারে একটা হেলিকপ্টার দেখতে পেয়েছে ড্রাইভার, সেই গল্প শোনাতে শোনাতে নিয়ে এল রানাদের সেন্ট মরিযে। একবারও তার সন্দেহ হলো না ওই হেলিকপ্টারের সাথে এই বিদেশীদের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে। মেইন রোডে নেমে পড়ল ওরা ধন্যবাদ জানিয়ে।

চলতে চলতে একটা রেস্তোরাঁর দিকে চেয়ে ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল গিলটি মিয়া।

'কিচু খেয়ে নিলে হয় না, স্যার?'

'সময় নেই, গিলটি মিয়া। ট্রেনে যদি রিফ্রেশমেন্ট কার থাকে তাহলে দেখা যাবে। পা চালাও এখন।'

স্টেশনে গিয়ে জানা গেল আগামী পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে কোন ট্রেন নেই। একগাল হাসল গিলটি মিয়া।

'এবার তাহলে কিচু...'

'নষ্ট করবার মত একটা সেকেণ্ডও নেই আমাদের হাতে, গিলটি মিয়া,' বলল রানা। 'সিলভিও ওই ফার্ম-হাউসে বসে বসে আঙুল চুষবে না। এতক্ষণে নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘনিয়ে তোলার ব্যবস্থা করে ফেলেছে ব্যাটা। হাল ছাড়বে না সহজে। আর

কোনও আক্রমণের সুযোগ দিতে চাই না আমি ওকে, হাত ফস্কে বেরিয়ে যেতে চাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। চলো, একটা গাড়ির ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখা যাক। রওনা হবার আগে খাবার কিনে নেব আমরা। পথ চলতে চলতে খাওয়া যাবে।'

দ্বিগুণ ভাড়া দেয়ার প্রস্তাব করায় শেষ পর্যন্ত রাজি হলো রেন্ট-এ কার ম্যানেজার। বিশ মিনিটের মধ্যে একটা কালো সিট্রন ডি. এস-এর পেট্রল ট্যাংক ভর্তি করে নিয়ে, এবং অতিরিক্ত সাবধানতার খাতিরে গোটা দুই দু-গ্যালনী টিনে পেট্রল ভরে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ওরা জুরিখের পথে।

'কতক্ষুণে পৌঁচব, স্যার?'

'রাত সাড়ে আটটার আগে না,' বলল রানা। 'দেড়শো মাইল যেতে হবে গাড়ি চালিয়ে।'

দশ মিনিটের মধ্যে সিলভাপ্লানা পৌঁছে ডান দিকে মোড় নিল রানা, ছুটল ফুল স্পীডে। মাথার মধ্যে একই স্পীডে চিন্তা চলেছে ওর। বুঝতে পারছে সে, এয়ারপোর্টে শেষ চেষ্টা করবে সিলভিও। একবার লণ্ডনের পথে রওনা হয়ে যেতে পারলে রানাকে আর কিছুতেই ঠেকাতে পারবে না ওরা। কাজেই সব রকম চেষ্টা করবে সে যাতে নোটবই নিয়ে কিছুতেই প্লেনে উঠতে না পারে ও। কিছু একটা কৌশল চিন্তা করে বের করতে হবে ওর যাতে ধোঁকা দেয়া যায় সিলভিওকে। অবশ্য কোনরকম গোলমাল না-ও হতে পারে। ওরা যে জুরিখের দিকে চলেছে সেটা সিলভিওর পক্ষে জানা সহজ নয়। ও হয়তো মনে করবে মিলানো গিয়ে প্লেন ধরবার চেষ্টা করবে রানা। তবু সাবধান হতে হবে। চিঠিতে অনিল লিখেছিল, সব সময় মনে রাখবে, সারা ইউরোপে ওদের লোক আছে...প্রত্যেক দেশে রয়েছে নেট-ওঅর্ক...যমের মত ভয় করে ওদেরকে সবাই। কোসা নোস্ট্রার প্রচণ্ড ক্ষমতা সম্পর্কে রানা নিজেও পূর্ণ ওয়াকিফহাল। ওদের দক্ষতাকে হেয় করে দেখবার

ধৃষ্টতা ওর অন্তত নেই।

চল্লিশ মিনিট পর কয়ের শহরে ঢুকল রানা, শহর এলাকা ছাড়িয়ে এসে আবার বাড়াল স্পীড। এবার ছুটেছে ওরা সারগানের দিকে। খাবারের প্যাকেট খুলল গিলটি মিয়া, গপাগপ গিলতে শুরু করল একটার পর একটা স্যাণ্ডউইচ। রানাও খেল কয়েকটা। কিন্তু মাইল দশেক গিয়েই চমকে উঠল রানা হঠাৎ। অদ্ভুত ধরনের আওয়াজ হলো এঞ্জিনে। গাড়ির গতি কমে আসছে।

পেট্রল গজের দিকে চেয়ে দেখল রানা। নাহ্ পেট্রল তো প্রচুর রয়েছে। দশ গ্যালন পেট্রল ভরিয়েছে সে সেন্ট মরিয়ে। তাহলে এত চমৎকার টিউন করা এঞ্জিন হঠাৎ গোলমাল শুরু করল কেন?
'কি হলো, স্যার? থামচেন কেন?'

'থামছি না। থেমে যাচ্ছে।'

গাড়িটা কিনার করে রেখে বেরিয়ে পড়ল রানা দরজা খুলে। প্রথমে এঞ্জিনের বনেট খুলল সে, তারগুলো পরীক্ষা করে দেখল, তারপর বুঝল কারবুরেটার না খুললে বোঝা যাবে না ব্যাপারটা। বুট থেকে টুল-কিট বের করে নিয়ে এল।

তিন মিনিটের মধ্যে টের পেল রানা গোলমালটা কোথায়। পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে উঠল ওর রাগে।

'হারামীর বাচ্চারা পানি মিশিয়ে দিয়েছে পেট্রলে!'

'সব্বোনাশ! একোন উপায়?'

'চার গ্যালন পেট্রল আছে টিনে,' বলল রানা। 'ট্যাংকের পানি ফেলে দিয়ে…'

'ঠিক বলেচেন!' ছুটে গিয়ে টিন দুটো নিয়ে এল গিলটি মিয়া।

ট্যাংকের তলা থেকে নাট খুলে সব পানি ঝরিয়ে দিল রানা রাস্তার উপর। নাটটা লাগাতে লাগাতে গিলটি মিয়াকে বলল, 'ঢালো পেট্রল ট্যাংকের ভেতর।'

একটা টিনের মুখ খুলে নাকের কাছে নিয়ে শুঁকে দেখল গিলটি মিয়া। ভ্রূ জোড়া কপালে উঠল ওর।

'পেট্টল কোতায়, স্যার! এর মদ্যেও তো পানি!'

মুখটা কালো হয়ে গেল রানার। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল গাড়ির নিচ থেকে।

সত্যিই! পরীক্ষা করে দেখল রানা, টিনের মধ্যে পরিষ্কার কলের জল।

'বাহ্! ভাল ঘোল দিয়েচে শালারা!' প্রশংসা না করে পারল না গিলটি মিয়া। 'এঁটকে দিয়েচে রাস্তার মধ্যে। কিন্তুক একোন একটা ব্যবস্তা তো করা দরকার। কি করা যায়, স্যার? পেট্টল লিয়ে আসব?' টিন থেকে পানি ঢেলে ফেলতে শুরু করল সে।

'পারবে তুমি?' দ্বিধাগ্রস্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা।

'কি যে বলেন, স্যার! আপনি হুকুম করলে পুরো পেট্টল পামটা বেচে দিয়ে আসতে পারি আরাকজনের কাচে। পারি না কি! আদ ঘণ্টা, বড়জোর এক ঘণ্টা, লিয়ে আসচি আমি পেট্টল।'

মাথা নিচু করে এপাশ-ওপাশ নাড়ছিল রানা, নিজের বোকামির জন্যে মনে মনে গাল দিচ্ছিল নিজেকে। পেট্রল ভরবার সময় একটু যদি খেয়াল করত তাহলে এখন এই অবস্থায় আটকে বসে থাকতে হত না রাস্তায়। অন্তত একটি ঘণ্টা পিছিয়ে গেল সে এখন। গাড়িটা এখানে ছেড়ে দিয়ে আর কোন গাড়িতে লিফট নেয়ার চেষ্টা করবে? না। তাতে আরও দেরি হয়ে যাবে জুরিখে গিয়ে পৌঁছতে। ঝট করে মাথা তুলল সে।

'কোথায় যাচ্ছ পেট্রল আনতে?'

'মাইল দশেক আগে একটা পেট্টল পাম দেকেছিলুম, স্যার। ওকান থেকেই ভাবচি…'

'যাবে কি করে?'

‘ঠ্যাঙা দেকিয়ে চলে যাব, স্যার। ঠ্যাঙা দেকালেই পোঁচে দেয় এদেশে যে কোন ডাইবার। মন খারাপ করে কোন লাভ নেই, স্যার, আমি রওনা হয়ে যাই, বেশি দেরি হবে না।’

‘দাঁড়াও, গিলটি মিয়া। অত তাড়াহুড়ো করো না। তাড়াহুড়ো করে একবার ভুল করেছি, আর ভুল করতে চাই না। কারও গাড়িতে যদি লিফট নিতে চাও এইখান থেকে সেটা সবচেয়ে সুবিধে হবে। এইখানে দাঁড়ালে যে-কোন দিক থেকে যে-কোন গাড়ি আসুক না কেন ভদ্রতার খাতিরে লিফট দিতে বাধ্য হবে।’

‘ঠিক বলেচেন, স্যার,’ এক কথায় রাজি হয়ে গেল গিলটি মিয়া।

‘আর একটা কথা, কি আশ্চর্য দ্রুত কাজ করেছে ওরা খেয়াল করেছ?’

‘করেচি, স্যার,’ একগাল হাসল গিলটি মিয়া। ‘অনেকটা আপনার মতই ঝটপট ওদের কাজ-কম্মো। তাজ্জব কারবার! এইটুকু সোমায়ের মদ্যেই গুবলেট করে দিলে পেট্রোলের মদ্যে।’

‘যেখানে পেট্রল আনতে যাচ্ছ, সেখানেও গুবলেট করে রেখেছে কিনা কে জানে?’

‘রেকেচে, স্যার। আমি জানি। ধরে লিচ্চি, রেকেচে। তাই তোয়ের হয়েই যাচ্চি। ধানাই-পানাই আমার কাচে খাটবে না।’ কান খাড়া করল গিলটি মিয়া একটা গাড়ির এঞ্জিনের শব্দে।

‘ঠিক আছে। এই গাড়িতেই তুলে দিচ্ছি তোমাকে। খুব সাবধান থাকবে। আমি এদিকে কার্বুরেটার পরিষ্কার করে সবকিছু চেকআপ করে নিয়ে পাহারা দিই গাড়িটা।’

রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়াল রানা। অনিচ্ছা সত্ত্বেও থামতে হলো ওপেলটাকে, না থামলে চাপা দিতে হয় রানাকে। ধুমসো মোটা এক লোক বিরক্ত ভঙ্গিতে চোখ-মুখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে।

‘পেট্রল ফুরিয়ে যাওয়ায় বিপদে পড়েছি। দয়া করে আমার এই সঙ্গীকে পাম্প পর্যন্ত একটু পৌঁছে দেবেন?’

সাহায্যের আবেদন এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই দেখে রেগে গেল লোকটা। আপনমনে গজ গজ করল গাড়িতে ওঠার সময় কেন মানুষের হুঁশ থাকে না সে-সম্পর্কে, শেষ পর্যন্ত পাশের দরজা খুলে দিল। ধন্যবাদ দিয়ে এঞ্জিনের পিছনে লাগল রানা, গিলটি মিয়া উঠে পড়ল গাড়িতে দু'হাতে দুটো খালি টিন নিয়ে।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর ফিরে এল গিলটি মিয়া পেট্রল পাম্পের ব্রেক-ডাউন ভ্যানে চড়ে। খুশি হয়ে উঠল রানা। আশ্চর্য লোকটা! এই বিদেশে কারও কথার একবিন্দু বোঝে না গিলটি মিয়া, ওর একটি কথাও বোঝে না কেউ, তবু দিব্যি কাজ চালিয়ে নিচ্ছে সে আকারে ইঙ্গিতে।

কিন্তু আকার-ইঙ্গিতের ধরন দেখে চমকে উঠল রানা। ড্রাইভিং সীটে বসা লোকটার পেটে খোঁচা দিল গিলটি মিয়া ওর ভয়ঙ্কর-দর্শন খেলনা পিস্তল দিয়ে। ভয়ে ভয়ে নেমে এল একজন ঢোলা জামা-কাপড় পরা শুকনো লম্বা নিষ্ঠুর চেহারার লোক।

‘কি ব্যাপার, গিলটি মিয়া?’ প্রশ্ন করল রানা।

‘বলচি, একটু দাঁড়ান, স্যার।’ পিস্তল দিয়ে এই গাড়ির পেটস্ল ট্যাংকের দিকে ইঙ্গিত করল সে লম্বা লোকটাকে। ‘হাঁ করে কি দেকচিস, হারামজাদা, ঢাল্ পেট্রোল যা আচে! একেবারে টই-টুম্বুর করে দিবি।’

লোকটা একবার রানা এবং গিলটি মিয়ার মুখের দিকে চেয়ে নিয়ে পাইপ লাগাল সিট্রনের ট্যাংকের মুখে। খুশি হয়ে রানার দিকে ফিরল গিলটি মিয়া।

‘এ শালা খুব হারামী, স্যার। অ্যা…ত বড় এক যন্তোর লিয়ে মারতে উটেচিল আমাকে। প্রথুম বলে; বনদো হয়ে গেচে দোকান। আমি বললুম দে বাবা, বিপদে পড়েচি, একটু নাহায়

সাহায্যই কর্। না। পচন্দ হলো না কতাটা। পোঁদ ঘুরিয়ে সোজা গিয়ে ঢুকল গ্যারেজে। বুজলুম, সিদে আঙ্গ□লে ঘি উটবে না। কেমন একটু সন্দো হলো, গেলুম পিচু পিচু। ও বাবা! সাঁই করে চালাল যন্তোরটা মাতা সই করে। বাউলি কেটে সরে গেলুম। তারপর বের করলুম পেস্তলটা। এটা দেকেই শালার চক্কু চড়কগাচ! একেবারে ঠাণ্ডা। ফিরিজের পানি। টিন দুটো ভরে দিতেই এই পিচ্চি-লরীতে পেট্রোল ভরতে বললুম। ভাবলুম, আপনার সাথে এ লোকের আলাপ করিয়ে দোয়া দরকার। তাই ওরই গাড়িতে করে লিয়ে এলুম শালাকে আপনার কাচে। এবার কতা বলুন ওর সাতে, আমি টিন দুটো নামাই।'

ব্রেক-ডাউন ভ্যানের ট্যাংক থেকে অর্ধেকের বেশি পেট্রল চলে এল সিট্রনের ট্যাংকে। পাইপটা বের করে নিয়ে ট্যাংকের মুখ লাগাচ্ছে লোকটা, ভয়ে ভয়ে চাইছে গিলটি মিয়ার দিকে। ওর সামনে এসে দাঁড়াল রানা।

'আমাদের কাছে পেট্রল বিক্রি না করার হুকুম পেয়েছ?'

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল লোকটা।

পিস্তলটা বের করল রানা, কিন্তু ততটা ভয় পেতে না দেখে খটাং করে লাথি মারল সে লোকটার হাঁটুর ছয় ইঞ্চি নিচে। 'কেঁউ' করে আর্তচিৎকার দিয়ে পা ভাঁজ করে চেপে ধরল লোকটা ব্যথার জায়গা।

'উত্তর দাও!' গর্জন করে উঠল রানা। 'আমরা বেপরোয়া লোক। খুন করতে বাধবে না!'

'টেলিফোন করেছিল আমার কাছে ওরা,' বলল লোকটা।

'তেল দিতে বারণ করেছিল?'

'হ্যাঁ। আর বলেছিল সম্ভব হলে যে-কোন রকম গোলমাল বাধিয়ে দেরি করিয়ে দিতে।'

'কতক্ষণ আগে ফোন পেয়েছ?'

'ঘণ্টাখানেক আগে।'

ভিতর ভিতর ভয়ানক বিচলিত হয়ে উঠল রানা খবরটা শুনে। তার মানে সিলভিও জানে ওরা কিসে করে কোনদিকে চলেছে। শুধু এয়ারপোর্টেই নয়, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স বা জার্মান বর্ডারেও ফাঁদ পাতা থাকবে ওদের জন্যে। পালাবার সব পথ বন্ধ করে দিয়ে তাড়া করে ধরা হবে ওদের এবার। এদেশেও পেট্রল চুরির দায়ে পুলিস লাগাবে নাকি ওদের পেছনে!

পেট্রলের দাম বাবদ যথেষ্ট পরিমাণ ইটালিয়ান কারেন্সি গুঁজে দিল রানা লোকটার হাতে।

'শোনো,' বলল রানা। 'কোসা নোস্ট্রার দুই দলের মধ্যে গোলমাল লেগেছে। এর সাথে নিজেকে জড়াতে গেলে মারা পড়বে যে-কোনও দলের হাতে। পাম্প বন্ধ করে বাড়ি চলে যাও। মুখ থেকে একটা কথা বের করলেই খুন হয়ে যাবে। আমার আরও লোক আসছে সেন্ট মরিয থেকে। সাবধান! ভাগো এখন।'

ভ্যানটা ঘুরিয়ে নিয়ে তুফান বেগে রওনা হয়ে গেল লোকটা। রানা উঠে পড়ল সিট্রনের ড্রাইভিং সীটে।

সারাগানস পেরিয়ে ওয়ালেনস্টাডের দিকে রওনা হলো সিট্রন ডি. এস.। পুরো একটা ঘণ্টা নষ্ট হয়ে গিয়েছে পেট্রলের গোলমালে, সেটা পুষিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে রানা বিপজ্জনক ভাবে গাড়ি চালিয়ে। অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে হাঁপিয়ে উঠল গিলটি মিয়া। খানিক উসখুস করে আপন মনে কথা বলতে শুরু করল।

'কিন্তুক এই দেরি করিয়ে দিয়ে লাব কি ওদের?'

'আমাদের যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে অভ্যর্থনার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে না ওদের?' বলল রানা। 'একটা ঘণ্টা অনেক সময়। এতক্ষণে তৈরি হয়ে গেছে ওরা। মুশকিল হচ্ছে আমরা কোন্ পথে কোন্ দিকে চলেছি জানা আছে ওদের, কিন্তু আমরা ওদের

কোন খবর পাচ্ছি না।'

'ঠিক বলেচেন। কি মতলব ঠাউরেচে টের পাওয়া যাচ্চে না। পথেই এঁটকে দোয়ার ব্যবস্তা করেচে কিনা জানা নেই আমাদের। আমি ভাবচি কি, পেলেনে আমাদের যাওয়ার দরকার কি? যে-কোন একটা বডারের দিকে রওনা দিলে কেমন হয়?'

'অসুবিধে আছে। এই ভাড়া করা গাড়ি নিয়ে আমরা যা খুশি তাই করতে পারি না। তাছাড়া অত ঝুঁকি না নিয়ে জুরিখেই যদি ওদের কোন কৌশলে ফাঁকি দিতে পারি তাহলে সবচেয়ে ভাল হয়। দেখা যাক, একটা না একটা বুদ্ধি এসে যাবে মাথায়, যাতে সময়ও বাঁচবে, পরিশ্রমও বাঁচবে।'

ওয়ালেন লেক ছাড়িয়ে এসেছে ওরা বেশ কিছুক্ষণ হয়, দূরে টলটলে পানিতে আলোর প্রতিবিম্ব দেখে রানা বুঝল এসে গেল জুরিখ লেক। আর পঁচিশ মাইল। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় পথে আক্রমণ আসবার সম্ভাবনা কমে গেছে বেশ খানিকটা। লেকের ধার ঘেঁষা রাস্তা দিয়ে ঘণ্টায় সত্তর মাইল বেগে ছুটছে ওরা। হঠাৎ কথা বলে উঠল রানা।

'একটা বাঙালী হোটেল চিনি আমি। ওখানেই উঠব আপাতত। তারপর দেখা যাবে কি করা যায়।'

'এই গাড়িটা হোটেলের সামনে দেকলে বুজে নেবে ওরা কোথায় উটেচি আমরা।'

'এটাকে ইউরোপা হোটেলের সামনে ছেড়ে দেয়ার কথা আছে রেন্ট-এ কার কোম্পানীর ম্যানেজারের সাথে। সেটা করতে যাওয়া আমাদের জন্যে বিপজ্জনক হবে। যে কোন একটা হোটেলের সামনে ছেড়ে দেব, খুঁজে নিক ওরা। পায়ে হেঁটে চলে যাব আমরা প্যালেস হোটেলে।'

জুরিখ পৌঁছে ঘড়ি দেখল রানা। রাত নয়টা। আধ ঘণ্টা পুষিয়ে নিয়েছে সে বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে

আধ মাইল হেঁটে প্যালেস হোটেলে গিয়ে হাজির হলো ওরা। ধূলি-মলিন জামা-কাপড় দেখে রিসেপশন-ক্লার্ক প্রথমটায় তেমন আমল দিতে চাইল না। ম্যানেজারের সাথে দেখা করার প্রস্তাবে একটু সচকিত হলো। রানা যখন বলল, এই হোটেলের মালিকের সাথে সে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত, তখন ব্যস্ত-সমস্ত ভঙ্গিতে নিয়ে গেল ওদেরকে ম্যানেজারের বন্ধ দরজার সামনে। চোখ বড় বড় করে বলল, 'ভয়ানক রাগী লোক, স্যার! আপনারাই ঢুকুন।'

বিরাট একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে সুইভেল চেয়ারে বসে কাগজপত্র ঘাঁটছে ধোপ দুরস্ত জামাকাপড় পরা একজন প্রকাণ্ড লম্বা চওড়া লোক। রানাকে ভ্রূ কুঁচকে দেখল আপাদমস্তক। কিন্তু গিলটি মিয়ার দিকে চোখ পড়তেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। কপালে উঠেছে ওর ভুরু জোড়া।

'আমনে! উস্তাদ! আমনে কৈত্থন!'

'কে! লেদু না? লাম্বা আহাম্মুক!' হাসি ফুটে উঠল গিলটি মিয়ার ঠোঁটে। 'তুই কি করচিস এখেনে?'

প্রকাণ্ড টেবিল ঘুরে এসে একেবারে পায়ে হাত দিয়ে সালাম শুরু করল ঝাড়া ছ'ফুট লম্বা লোকটা গিলটি মিয়াকে। উঠে দাঁড়ালে আর নাগাল পাবে না, তাই বাঁকা থাকতে থাকতেই চট করে থুতনি ধরে আদর করল গিলটি মিয়া ওকে।

বসল সবাই। একগাল হাসল গিলটি মিয়া।

'কতদিন দেকা নেই! জেল থেকে বেরোলি কবে?' রানার দিকে ফিরে বলল, 'আমার স্যাঙাৎ, স্যার।'

'কি কমু, উস্তাদ! দুক্কের কতা কি কমু। স্বাদীনতার লগে লগেই দ বাইরোয়া পরছিলাম। কই যাই ভাবতাছি, ইমুন সময় কানডা চাইপপ্তা দরল আমার চাচায়। আইন্যা ফালাইল এই ফডোলে। কয়, দেহি কত চুরি করবার পারস। পরথম তিনডা মাস বুক বাসাইয়া কানলাম, উস্তাদ। তারপর শুরু করলাম।

তিনডা বছরে, উস্তাদ, থুই নাই কিসু। সুইস ব্যাঙ বইরা ফালাইবার দশা করছিলাম, অহন হুনি আমার নামেই লেইখ্যা দিতাসে চাচায় এই ফডোল। হালার মাইয়াডারে আবার বিয়া কইরা ফালাইসি দ!'

'বিয়েও করে ফেলেচিস! বাহ! তাইলে তো বেশ সুকেই আচিস মনে হচ্চে।'

'না, উস্তাদ। দ্যাশের লাইগ্যা পরানডা পুরে! যাউগ গা, আমনের খবর কন। ইয়ানো ক্যামনে কৈত্থন আইলেন?'

'সে অনেক হিস্টিরী। অত কতা বলবার সোমায় নেই। অল্প কিছুক্ষণ আচি। চলে যাব আজই। আমাদের পেচনে আবার বাজে লোক লেগে আচে। ওদের চোক ফাঁকি দিয়ে আজই পালাতে হবে আমাদের।'

'আমি থাকতে আর কুনো চিন্তা নাই, উস্তাদ। কি লাগবো খালি হুকুম করবেন, আইন্যা হাজির করুম।'

রানার দিকে ফিরল গিলটি মিয়া।

'কি কি লাগবে বলে ফেলুন, স্যার। ছেলেটা ভাল। সাদ্য মতো করবে।'

'আপাতত একটা রূম দরকার। আধ ঘণ্টার মধ্যে রূমে বসে আমরা খেয়ে নিতে চাই। আর, কেউ আমাদের কথা জিজ্ঞেস করলে বলতে হবে যে আমরা এই হোটেলে উঠিনি। ব্যস, এই।'

'এইডা কুনো কাম অইলো, স্যার? কি মুসিবতে পরছেন, আমি কি সাইয্য করার পারি, হেইডা না কইবেন।'

'ও ব্যাপারে আপনার কিছুই করবার নেই,' বলল রানা। 'কোসা নোস্ত্রা।'

'সারসে! আই সব্বোনাশ! এইডা কি কন!' ফ্যাকাসে হয়ে গেল ম্যানেজারের মুখটা। 'হ্যাগোর লগে বাইজ্যা বইসেন! ঠাইট মাইরা লাইব দ।'

'সেইজন্যেই আপনাকে এর মধ্যে জড়াতে চাই না। রিসেপশন ক্লার্ককে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে আপনি নিজে যদি আমাদেরকে ঘরে পৌঁছে দেন তাহলে সবচেয়ে ভাল হয়।'

'একশৎ বার। আমনেরা বয়েন, আমি নিজে গিয়া হ্যারে কইয়া আহি আগে।'

ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে একটুও ভুল করেনি লোকটা। দ্রুতপায়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

'গুরুভক্তির নমুনা দেকে তো মনে হয় যেটুকু কাজ দোয়া হয়েচে ঠিক ঠিকই করবে। কিন্তুক বে-থা করে সংসারিক হয়েচে একোন, ওকে এসবের মদ্যে না জড়িয়ে ভালই করেচেন, স্যার।'

টেবিলের উপর থেকে টেলিফোন ডাইরেক্টরীটা টেনে নিয়ে এয়ারপোর্টের নম্বর বের করল রানা। রিসিভার তুলে নিয়ে ডায়াল করল। জানা গেল, লণ্ডনের দুটো ফ্লাইট আছে আজ- একটা সাড়ে এগারোটায়, অপরটা রাত দেড়টায়।

লম্বা পা ফেলে ঘরে এসে ঢুকল লেদু।

'আহেন আমার লগে। খারোন, এই দরজাটা দিয়া লই।' ভিতর থেকে দরজা লাগিয়ে দিয়ে ডাকল, 'আহেন। এই দিক দা।'

একটা সাইড ডোর দিয়ে বের করে নিয়ে এল ম্যানেজার ওদের নির্জন করিডরে, কয়েক পা এগিয়ে লিফট। লিফট এসে থামল পাঁচ তলায়। লম্বা করিডর ধরে এগিয়ে চারশো ছেচল্লিশ নম্বর কামরায় চাবি লাগাল ম্যানেজার। ঘর খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'খানা কি খাইবেন, উস্তাদ? দেশী না বিদেশী?'

'দেশী, দেশী!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল গিলটি মিয়া। 'সবচে ভাল হয় যদি ডাল, ভাত, আলুভত্তা আর কাঁচামরিচের ব্যবস্তা করতে পারিস।'

হাসল ম্যানেজার। মাথা নাড়ল।

'উস্তাদের ডাইল খাওনের শখ রইছে দেহি অহনও? কিন্তুক ফিডাইয়া মাইরা লাইব আমারে বউয়ে যদি হুনে উস্তাদেরে ডাইল-বাত খাওয়াইয়া বিদাই দিসি। বড় ডরাই হুযুর, অরে খবর না দিলে জবর গোশ্‌শা অইব। ডাইলের কতা কমুনে, বাকিডা হ্যার হাতেই ছাইরা দেই, কি কন?' রানার দিকে ফিরল, 'আর আমনেরে কি খাতির করুম, স্যার? কি খাইবেন?'

'আমাকে বিশেষ কোন খাতির করতে হবে না,' মৃদু হাসল রানা। 'এক খাতিরেই আমাদের দু'জনের হয়ে যাবে। তবে খাতিরটা একটু তাড়াতাড়ি করুন। সাড়ে এগারোটার ফ্লাইটে লণ্ডনের প্লেন ধরবার চেষ্টা করব আমরা।'

ব্যস্তসমস্ত হয়ে চলে যাচ্ছিল ম্যানেজার, হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

'আমনেরে কি নামে খুজ করব হ্যারা এইডা দ জিগান হয় নাই?'

'মাসুদ রানা।'

দুই চোখ কপালে উঠল ম্যানেজারের।

'হাইরি সব্বোনাশ! আমনেই হেই মাসুদ রানা সায়েব! কি খুশির দিন রে! কী সৌবাইগ্য আইজ আমার! কার মুখ দেইখ্যা উটছিলাম আইজ ঘুম থেইক্যা। এই বিদ্যাশে হটেশ আইসা হাজির আইজ আমার ওস্তাদে, আর তিন বচ্ছর দইরা বিয়ান হাইঞ্জা বেলা যার নাম হুনতাছি হউরের মুখে, দেহা তার আইজই পাইলাম! কী আচাইয্য! অক্ষণে ফাল দিয়া আয়া পরব চাচায় খবর হুনলে। আমনেই না বাচাইছিলেন হ্যারে ডামুইডিয়ায় ডাহাইতের হাত থন?'

'পা কি ভাল হয়ে গেছে ওর?'

'না, স্যার। ডাইন ফাওডা কাইট্টা লাইসে। কাডের ফাও দা আডে।'

ঘড়ি দেখল রানা।

'আমরা কাদের তাড়া খেয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি বলেছি আপনাকে। আমাদের উপস্থিতিটা যত কম জানাজানি হয় ততই ভাল। বুঝতে পেরেছেন?'

'বুঝলাম। খামোশ খায়া থাহন লাগব। আইচ্চা, কবুল। আমনেরা জিরাইয়া লন, আমি খাওনের বন্দোবস্তডা করি।'

ম্যানেজার বেরিয়ে যেতেই দরজা লাগিয়ে দিয়ে বাথরূমে গিয়ে ঢুকল রানা। সেই পুরানো জামাকাপড়ই পরতে হলো, কিন্তু দাড়ি কামিয়ে, দাঁত মেজে, স্নান সেরে নতুন গেঞ্জি ও জাঙ্গিয়া পরে রীতিমত আরাম বোধ করল সে। বেরিয়ে এসে নরম বিছানায় শুয়ে সিগারেট ধরাল। গিলটি মিয়া গিয়ে ঢুকল বাথরূমে।

গত কয়েকদিনের পরিশ্রমের পর নরম বিছানা পেয়ে দু'চোখ ভেঙে ঘুম আসতে চাইছে রানার। চোখ লেগে আসছিল, এমনি সময়ে খুট করে বাথরূমের দরজা খুলে গিলটি মিয়া বেরিয়ে এল। কেটে গেল তন্দ্রার ভাবটা। খাট ছেড়ে উঠে পায়চারি শুরু করল সে।

আশ্চর্য করিৎকর্মা লোক লেদু। আধঘণ্টার মধ্যেই সব ব্যবস্থা করে দু'জন বেয়ারার হাতে মস্ত দুটো ট্রে ভর্তি খাবার নিয়ে হাজির হলো। দরজায় টোকা দিতেই পিস্তল হাতে বাথরূমে গিয়ে দাঁড়াল রানা, গিলটি মিয়াকে ইঙ্গিত করল দরজা খুলে দেয়ার জন্যে। ম্যানেজার এসে ঢুকতেই পিস্তলটা যথাস্থানে গুঁজে বেরিয়ে এল বাথরূম থেকে।

বেয়ারাদের বিদায় দিয়ে দরজা লাগিয়ে এসে পরিবেশনে মন দিল ম্যানেজার।

এত রকমের ব্যঞ্জন দেখে পরিষ্কার বোঝা গেল এর বেশির ভাগই তৈরি হয়েছে বাড়িতে। প্রথমে খুব খুশি হয়ে উঠল গিলটি মিয়া, তারপর গম্ভীর হয়ে গেল।

‘এটা কি করেচিস, লেদু? তোদের নিজেদের খাবার উটিয়ে লিয়ে এসেচিস নিচ্চয়? এত রান্না তো আদঘণ্টায় হয় না?’ হাত গুটিয়ে নেয়ার উপক্রম করল সে।

একেবারে মোক্ষম অস্ত্র ছাড়ল লেদু।

‘আমার লগে তেরিবেরি খাটব না, উস্তাদ। আমনে অহন খাওন বন্দ করলে তিন দিন আমি কিচ্চু খামু না কইয়া দিলাম। আল্লার কসম! আমি জবান লারি না, আমনে দ জানেন।’ পরাজিত ভঙ্গিতে আবার খাওয়ায় মন দিতে দেখে বলল, ‘আমি শুদু কইসি আমার মইদ্যে যেটুকু বুরা দ্যাহ, হেইটুক আমার বাপ-চাচার থন পাইসি; আর যেটুকু বালা দ্যাহ, হেইটুক দিসে আমার উস্তাদে। বাস, আর কিচ্চু কওন লাগে নাই। যুর কইরা যা আছিল্ সব তুইলা দিছে বউয়ে। হেতিয়ে কয়, আবার ফাক করতে নাই দুইগণ্টা দেরি অইব, যা আছে লইয়া যাও স্বপনের বাপ...’

খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত অনর্গল গল্প করল ধোপ-দুরস্ত বিদেশী কাপড় পরা ম্যানেজার খাস দেশী বাংলায়। এটা ওটা তুলে দিল, না খেতে চাইলে ঝগড়া করল। খাওয়া শেষ করে হাত মুখ ধুয়ে আসতেই পাড়ল আসল কথা।

‘একজনে আইছিল, স্যার। জিগায়া গেছে আমনেগো কতা।’

‘কখন এসেছিল?’

‘এই দশ-পনেরো মিনিট অইব। কেরানী কইছে, না, এই ফডোলে উডে নাই হ্যারা। কিন্তুক বিশ্বাস যায় নাই। রেসটি খুইলা দেইখা তারপর গেছে।’

‘চেহারার বর্ণনা দিতে পারবেন?’

‘বাইঠা। মোডা। কালা স্যুট আছিল পরনে। ইডালীর লোক বইলা মালুম হয়।’

‘গীয়ান!’ গিলটি মিয়ার দিকে চেয়ে বলল রানা। ‘তার মানে জুরিখে পৌঁছে গেছে সিলভিও দলবলসহ।’

একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরময় বার দুই পায়চারি করেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা। ফিরল লেদুর দিকে।

‘এখান থেকে ইণ্ডিয়ান কনসুলেট কতদূর?’

‘আদা মিনিটের রাস্তা,’ বলল ম্যানেজার। ‘বাইরোইয়াই বাও দিকে গেলে ছয়-সাত বিল্ডিং পার অইলে ছাতের উপর ফেলেগ দেহা যাইব। ঈডাই।’

‘ভেরি গুড। দশ মিনিট একা থাকতে চাই আমরা। তারপর এই হোটেলের পিছন দিয়ে বেরোবার কোন রাস্তা থাকলে সেই পথে বেরিয়ে যেতে চাই।’

‘একশৎ বার,’ বলল ম্যানেজার। টিপ দিল কলিং বেলে। ‘আমি নিজে রাস্তা দেহাইয়া দিমু।’

দুই বেয়ারার সাহায্যে এঁটো থালা বাসন নিয়ে চলে গেল সে। দরজা লাগিয়ে দিল গিলটি মিয়া।

‘কনসুলেটের কতা জিজ্ঞেস করলেন কেন? কি করবেন ভাবচেন, স্যার?’

‘একটা ধোকাবাজির প্ল্যান এসেছে মাথায়। দেখা যাক কাজে লাগে কিনা।’

নীল প্লাস্টিক মোড়া প্যাকেটটা বের করল রানা। ছোট্ট লাল বইটা বের করে রাখল জ্যাকেটের সাইড পকেটে। তারপর টেবিলের উপর রাখা একখানা স্ক্রিব্‌লিং-প্যাড থেকে গোটা বিশেক কাগজ খসিয়ে নিয়ে চারভাঁজ করল। ওজনটা পছন্দ হলো না, পিস্তল থেকে একটা বুলেট বের করে গুঁজে দিল একটা ভাঁজে। এবার ইলাস্টিক ব্যাণ্ড মুড়ে রাখল ওটাকে নীল প্লাস্টিকের খোলের মধ্যে। আবার ওজন নিয়ে সন্তুষ্ট হলো। তারপর খস-খস করে চিঠি লিখল একটা। সেটাকে খামে বন্দী করে খামের মুখ আঠা দিয়ে লাগিয়ে প্লাস্টিক-প্যাকেট আর চিঠিটা রেখে দিল বুক পকেটে। তারপর সিগারেটে লম্বা করে একটা টান দিয়ে হাসল।

'ব্যাপারটা একটু বুজিয়ে দিন, স্যার। আমার মাতায় ঢুঁকচে না।'

টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভার কানে তুলে নিল রানা।

'আমি লেদু, স্যার।' ম্যানেজারের কণ্ঠ ভেসে এল। 'এট্টু আগে আবোর আইছিল হেই গায়েন। মোডা লোকটা। ধমক দিয়া গেছে কেরানীরে। কয়, দুইজন টুরিসরে ঢুকতে দেহা গেছে এই ফডোলে।'

'সে কি উত্তর দিয়েছে?'

'হ্যায় কইসে বাইরোইতেও দেহা গেছে, তহন কি চক্ষু বুইজ্যা আছিলা? আইছিল্, আমরা খেদায়া দিছি। ফহির মিসকিন আর টুরিসের লগে আমগোর কুনো খাতির নাই।'

'ঠিক আছে। অনেক অসুবিধায় ফেললাম আপনাকে, কষ্ট দিলাম অনেক। এবার আমরা রওনা হতে চাই।'

'ঈতান কইয়া আর শরম দিয়েন না, স্যার। আমি আইতাসি।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে রানা বলল, 'একে তো হোটেলের বিল দিতে যাওয়াটা উচিত হবে না, তাই না?'

'না, স্যার। বেইজ্জত করা হবে অনেকটা।'

'তাহলে এক কাজ করো,' পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল রানা। দশ-বারোটা পাঁচ হাজার লিরার নোট বের করে দিল গিলটি মিয়ার হাতে। 'ওর ছেলে স্বপনকে কিছু কিনে দিতে বোলো।'

'তাই ভাল, স্যার।'

'আবার এসেছিল গীয়ান। আমার মনে হচ্ছে ইণ্ডিয়ান কনসুলেটে পৌঁছানো সহজ হবে না।' দরজায় মৃদু টোকা পড়ল। সেদিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'দেখো তো কে?'

পিস্তল হাতে আবার বাথরুমে ঢুকল রানা। সাবধানে দরজা

খুলে উঁকি দিল গিলটি মিয়া। ঘরে ঢুকল ম্যানেজার। বেরিয়ে এল রানা।

'এবার আমরা যাব। কোন্ পথে নামতে হবে দেখিয়ে দিয়েই আপনার ছুটি।'

'কন কি, স্যার। আমনেগো পৌচ্চায়া দিয়া তারপর ছুডি।'

'ওনার কতার ওপরে কতা বোলো না, লাম্বা আহাম্মুক!' ধমক দিল গিলটি মিয়া। 'নাও ধরো।'

নোট দেখে আঁৎকে উঠল লেদু। 'এইডা কি করতাছেন, উস্তাদ!'

'তোর জন্যে না রে, গাদা। এগুলো তোর ছেলের জন্যে। নে ধর্, কিচু কিনে দিস ওকে। খেলনা-ফেলনা যা তোর পচোন্দ হয় দিস।' নোটগুলো জোর করে লেদুর হাতে গুঁজে দিয়ে রাকস্যাকের দিকে ফিরল গিলটি মিয়া।

'ওগুলো থাক, গিলটি মিয়া, ও আর দরকার হবে বলে মনে হয় না।'

লিফটের মুখেই বিদায় নিল ওরা ম্যানেজারের কাছ থেকে। দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই নামতে শুরু করল লিফট। রানার দিকে ফিরল গিলটি মিয়া।

'কিন্তুক ব্যাপারটা আমি ঠিক বুজতে পারচি না, স্যার। কনসুলেটে যাচ্চি কেন? আর যাচ্চিই যদি, এত আগে কেন? এয়ারপোটে রওয়ানা দোয়ার সোমায়...'

'অনিল জানিয়েছে যত যাই ঘটুক না কেন রঞ্জন চৌধুরীর হাতে দিতে হবে আমার এই খাতাটা। কাউকে বিশ্বাস করতে বারণ করেছে। আমি করিও না। কিন্তু এমন ভান করতে চাই যেন খাতাটা আমি কনসালের হাতে তুলে দিচ্ছি। আসলে ওর ভিতর কি আছে তুমি তো জানোই! বিশেষ করে অনুরোধ করব আমি

যেন এটা ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে করে খুবই গোপনীয়তা আর সাবধানতার সাথে রঞ্জন চৌধুরীর হাতে পৌঁছবার ব্যবস্থা করা হয়। আমার কথার ততটা গুরুত্ব না দিলেও একবার কলকাতায় রঞ্জন চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করলেই সতর্ক হয়ে যাবে কনসাল। আমার বিশ্বাস সিলভিওর লোক আছে ইণ্ডিয়ান কনসুলেটে। যত সাবধানই হোক না কেন খবরটা বেরিয়ে যাবেই। আমরা কনসুলেটে ঢোকার পর পরই খবর নেয়ার চেষ্টা করবে সিলভিও, কি করছি আমরা ওখানে। যেই জানবে যে একটা নীল প্লাস্টিক মোড়া প্যাকেট দিয়েছি আমরা কনসালকে, পেট চেপে ধরে হাসবে সে। কারণ ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগ থেকে ওটা হাতানো ওর জন্যে ডালভাত। আমি আশা করছি, এই খবর জানার পর আমাদের পিছু ধাওয়া করা ছেড়ে দেবে সে, নিরাপদে উঠতে পারব আমরা প্লেনে। আমাদের সাথে ওর ব্যক্তিগত কোন শত্রুতা নেই- ওর চাই শুধু প্যাকেটটা। আসল ব্যাপার টের পেতে পেতে আমরা ফুড়ুৎ করে উড়ে যাব নাগালের বাইরে।'

হেসে উঠল গিলটি মিয়া। 'দারুণ বুদ্ধি বের করেচেন, স্যার।'

'এখন কনসুলেট পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে হয়।'

লিফট থেকে বেরিয়ে ম্লান-আলোকিত একটা চত্বর পেরিয়ে রাস্তার পাশের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা।

চাপা গলায় বলল রানা, 'আমি দশ গজ এগিয়ে গেলে তারপর পিছু পিছু রওনা হবে তুমি।'

'গুলিটা যাতে আপনার ওপর দিয়েই যায়, সেজন্যে?'

'তর্ক কোরো না, গিলটি মিয়া। যা বলছি তাই করো। আর, যদি গুলি ছুঁড়তে হয়, চোখ সই করে মারবে।'

সাবধানে দরজা খুলে মাথাটা বের করল রানা বাইরে।

বেশ চওড়া রাস্তা। দূরে দূরে এক একটা ল্যাম্প পোস্ট ফুটপাথের খানিকটা অংশ আলোকিত করেছে। বাকি অংশ

অন্ধকার। যে কোন সংখ্যক লোক বাড়িগুলোর গেটের পাশে, বাগানে, বা দরজার কাছে অন্ধকার ছায়ায় লুকিয়ে থাকতে পারে। আগে থেকে বুঝবার কোন উপায় নেই।

পিস্তলটা বের করে হাতে নিল রানা। দ্রুতপায়ে এগোতে শুরু করল দেয়াল ঘেঁষে।

একটা বাড়ির মাথায় ফ্ল্যাগ দেখতে পেল রানা। কাছেই। আর তিনটে বাড়ির পর।

চট করে ঘাড় ফিরিয়ে গিলটি মিয়াকে খুঁজল রানা। পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, কিন্তু ও জানে, কাছেই কোথাও আছে সে।

হঠাৎ রাস্তার অপর পাশে একটা বাড়ির দরজার সামনে ম্যাচ জ্বলে উঠল। কিন্তু সিগারেট না ধরিয়ে রাস্তার উপর ছুঁড়ে ফেলল লোকটা জ্বলন্ত কাঠি।

মুহূর্তে বুঝতে পারল রানা, এটা কোনও সংকেত। দৌড় দিল সে। পিছনে কোথাও মৃদু গর্জন করে স্টার্ট নিল একটা গাড়ির এঞ্জিন- স্পষ্ট শুনতে পেল সে। এগিয়ে আসছে।

গিলটি মিয়ার পায়ের শব্দ শুনতে পেল রানা পিছনে। দৌড়াচ্ছে সে-ও।

পিছনে গাড়ির এঞ্জিনের শব্দটা দ্রুত এগিয়ে আসছে, অনেক কাছে চলে এসেছে সেটা। হঠাৎ রানা বুঝতে পারল কনসুলেটে পৌঁছবার আগেই গাড়িটা ওভারটেক করবে ওকে।

পিছন ফিরে চাইল রানা।

কালো একটা গাড়ি ছুটে আসছে তীর বেগে। আলো নেভানো। রানা চাইতেই দপ করে জ্বলে উঠল চারটে হেডলাইট। মুহূর্তে চোখ ধাঁধিয়ে গেল রানার। কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছে না সে আর চোখে। দেয়ালের গায়ে সেঁটে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা।

'শুয়ে পড়ুন, স্যার! গুলি করবে!' গিলটি মিয়ার গলার আওয়াজ পেল রানা।

কড় কড় করে গর্জে উঠল একটা এল. এম. জি. গাড়ির ভিতর থেকে। গতি কমাচ্ছে গাড়িটা। ততক্ষণে শুয়ে পড়েছে রানা ফুটপাথের উপর। ফুলঝুরির মত আলোর ফুলকি বেরোচ্ছে মেশিন গানের মুখ দিয়ে। পিছনের দেয়ালটা ঝাঁঝরা হয়ে গেল। গুলি করল রানা।

গাড়ির ভিতর আর্তনাদ করে উঠল একজন লোক। পরমুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠল আরেকজন। রানা বুঝল দ্বিতীয়জন চিৎকার করেছে গিলটি মিয়ার নিঃশব্দ গুলি খেয়ে। হঠাৎ গতি বেড়ে গেল গাড়িটার। সাঁ করে বেরিয়ে গেল সেটা, অদৃশ্য হয়ে গেল বাঁয়ে মোড় নিয়ে।

উঠে দাঁড়াচ্ছিল রানা, ঝপ করে শুয়ে পড়ল আবার। রাস্তার অপর পারে দরজার আড়ালে দাঁড়ানো লোকটা গুলি করল। রানার চামড়ার জ্যাকেটের খানিকটা অংশ ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল গুলিটা কাঁধ ঘেঁষে।

গুলি করল রানা।

এলোমেলো পা ফেলে আলোকিত রাস্তায় বেরিয়ে এল একজন লোক, শরীরটা বাঁকা হয়ে আছে সামনের দিকে, চার-পাঁচ পা এগিয়ে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে রাস্তার ওপর উপুড় হয়ে।

গিলটি মিয়াকে দেখা গেল এবার, লম্বা পা ফেলে দৌড়ে আসছে এদিকে। এক লাফে উঠে দাঁড়াল রানা। প্রাণপণে ছুটল দু'জন কনসুলেটের গেটের দিকে।

দ্রুতপায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল দু'জন। এমনি সময় দু'পাট খুলে গেল বন্ধ দরজাটা। স্টেনগান হাতে বেরিয়ে এল দু'জন প্রহরী।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা ও গিলটি মিয়া। মাথার উপর হাত তুলল রানা। দেখাদেখি গিলটি মিয়াও।

'ব্যাপার কি? থার্ড ওয়ার্লড্ ওঅর?' প্রশ্ন করল একজন

সিকিউরিটি গার্ড।

'কনসালের সঙ্গে জরুরী দরকার আছে আমার,' বলল রানা। 'একটু আগে যে আওয়াজ পেয়েছেন, সেটা আমাকে খুন করবার একটা ব্যর্থ প্রয়াস। শিগগির ঘরের ভেতর ঢুকে না পড়লে আবার গুলি হবে।' রাস্তার দিকে চেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল রানা। আসছে আবার গাড়িটা। ওটার মধ্যে থেকেই গুলি করা হয়েছিল।

'আপনারা ভারতীয়? বাঙালী?'

'বাঙালী, কিন্তু ভারতীয় নই, বাংলাদেশের লোক। তাড়াতাড়ি করুন, এসে পড়ল!'

তর্কের ভঙ্গিতে শুরু করল একজন, 'বাংলাদেশের লোক হলে এই কনসুলেটে কেন? আপনাদের কনসুলেট…'

গতি কমে আসছে গাড়িটার। দ্বিতীয়জন বুঝতে পারল ব্যাপারটার তাৎপর্য। কিন্তু স্টেন গানের মুখটা সরল না।

'জলদি ঢুকে পড়ুন!'

ঢুকে পড়ল রানা ও গিলটি মিয়া।

'দরজার সামনে থেকে সরে যাও। গিলটি মিয়া। দেয়ালের আড়ালে!' চাপা গলায় বলল রানা।

চট করে সরে গেল গিলটি মিয়া। রানাও সরল, এবং হ্যাঁচকা একটানে সরিয়ে আনল বোকা প্রহরীটাকে খোলা দরজার সামনে থেকে।

পরমুহূর্তে আবার গর্জে উঠল মেশিনগান। ক্ষিপ্ত বোলতার মত বোঁ বোঁ আওয়াজ তুলে একঝাঁক গুলি ঢুকল খোলা দরজা দিয়ে। আন্দাজের উপর নির্ভর করে শুধু ডান হাতটা বের করে গুলি করল রানা। থেমে গেল মেশিনগান, গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ বাড়ল। ছুটে গিয়ে একটা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে দেখল রানা রাস্তার উপর পড়ে থাকা দেহটা তুলছে দু'জন লোক গাড়িতে। তিন সেকেণ্ড পর তীরবেগে যে পথে এসেছিল সেই পথে অদৃশ্য হয়ে গেল

কালো গাড়িটা।

দরজাটা বন্ধ করে রানার দিকে ফিরল বোকা প্রহরীটা।

'আমার প্রাণ রক্ষা করার জন্যে ধন্যবাদ, মিস্টার...'

'মাসুদ রানা।' কথা জুগিয়ে দিল গিলটি মিয়া একগাল হেসে। 'ওনার নাম মাসুদ রানা।'

দশ

ইণ্ডিয়ান কনসুলেটের প্রকাণ্ড একটা গাড়িতে এয়ারপোর্টের দিকে চলেছে রানা ও গিলটি মিয়া। ড্রাইভারের পাশে বসে আছে একজন আর্মড্ গার্ড। পিছনে দুটো মোটর সাইকেলে করে চলেছে দু'জন স্টেন-গানধারী সিপাই। সতর্ক। প্রস্তুত।

কনসাল ভীমসেন নায়ার খুবই দ্রুত কাজ করেছেন বলতে হবে। আসলে কনসুলেটের উপর এই সশস্ত্র হামলায় খেপে একেবারে আগুন হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। এখানে ওখানে ফোন করে ঠাণ্ডা জুরিখ শহর গরম করে তুলেছিলেন। রানার বক্তব্য শুনে, এবং নীল প্যাকেটটার মধ্যে ভারতের জন্যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে আঁচ করতে পেরে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন আরও বেশি। কথা দিলেন, রানার এত কষ্ট স্বীকার করে এত দূর থেকে বয়ে আনা প্যাকেটটা তিনি যথেষ্ট সাবধানতার সাথে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে করে কলকাতায় পৌঁছবার ব্যবস্থা করবেন। এতসব উত্তেজনার মধ্যেও গোপনে একবার কলকাতার সাথে যোগাযোগ করতেও ভুললেন না ভীমসেন।

রঞ্জন চৌধুরীর সাথে তাঁর কি কথা হয়েছিল রানা জানে না, কিন্তু পনেরো মিনিট পর যখন ভীমসেন নায়ার আবার এসে

ঢুকলেন ওয়েটিং রূমে, স্পষ্ট অনুভব করতে পারল রানা, বিন্দুমাত্র সন্দেহের চিহ্নও নেই তখন আর তাঁর মনে। রানার নিরাপত্তার কথা ভেবে গাড়ি আর গার্ডের ব্যবস্থা করে ফেললেন দশ মিনিটের মধ্যে। টেলিফোনে বুক করে ফেললেন টিকেট। এখন বাকি শুধু প্লেনে উঠে বসা। সাধ্যমত সবই করেছেন ভদ্রলোক।

'এ যাত্রা বোধায় বেঁচে গেলুম, স্যার।' দূর থেকে এয়ারপোর্টের বাতি দেখে একগাল হাসল গিলটি মিয়া। 'উফ্, কম ধকলটা যায়নি এ ক'টা দিন! কিন্তুক মজাও লেগেচে দারুণ। কি বলেন? পেলেনে উটে এমন এক ঘুম দোব না...'

রিসেপশন অফিসের কাছে থেমে দাঁড়াল গাড়িটা।

'আপনারা একটু অপেক্ষা করুন, আমি জেনে আসি কত নম্বর রানওয়েতে রয়েছে প্লেন।'

গার্ডটা গাড়ি থেকে নেমে যেতেই গাড়ির দুই পাশে এসে দাঁড়াল মোটর সাইকেল আরোহী দু'জন। সতর্ক। প্রস্তুত। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাইছে চারদিকে।

তিন মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল গার্ডটা রিসেপশন অফিস থেকে।

'এই যে আপনাদের টিকেট।' অ্যালিটালিয়ার মার্কা মারা দুটো টিকেট এগিয়ে দিল গার্ড। 'দশ মিনিট অপেক্ষা করতে হবে আপনাদের। বে ফাইভে আছে প্লেনটা। আপনারা উঠবার আগে ওটা সার্চ করে দেখার অর্ডার আছে আমার ওপর। অবশ্য সার্চ করতে বেশিক্ষণ লাগবে না।'

'লাগুক, লাগুক!' সোৎসাহে বলল গিলটি মিয়া। 'ভাল করে খোঁজো বাওয়া, বোম-টোম থাকলেই গেচি।'

গাড়িতে উঠে বসল গার্ড। টারমাকের উপর দিয়ে বে-ফাইভের দিকে চলল গাড়ি দ্রুত বেগে। ওখানে একটা রিসেপশন রূমের সামনে জনা পাঁচেক লোক দাঁড়ানো।

পিছন দিক দিয়ে ঘুরে ভি. আই. পি. লেখা একটা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িটা।

'ভেতরে ঢুকে পড়ুন, স্যার,' বলল গার্ডটা। 'বাইরে একজন পাহারা দেবে, আর আমরা বাকি দু'জন যাব প্লেনটা সার্চ করতে। অল ক্লিয়ার দেখলে আমি ডাকব আপনাদের।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা।

দ্রুত পায়ে চলে এল রানা ও গিলটি মিয়া কামরার মধ্যে। ঘরের ভিতরটা একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল গার্ড, কি যেন আদেশ দিল কাউকে, তিন সেকেণ্ড পর চলে গেল মোটর সাইকেল দুটো।

ফোমের সোফায় বসে এক কান থেকে আর এক কান পর্যন্ত হাসল গিলটি মিয়া।

'খাতিরটা দেকেচেন, স্যার? আরও অনেক আগেই কোনও কনসুলেটে যাওয়া উচিত ছিল আমাদের। তাই না?'

জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল রানা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলাল বাম থেকে ডাইনে। এত সহজে ছেড়ে দেবে ওদের সিলভিও? শেষ চেষ্টা করবে না একবার?

'সরে আসুন, স্যার।' বলল গিলটি মিয়া। 'জানালার কাচে না দাঁড়ানোই ভাল। বলা তো যায় না...' আঁৎকে উঠে থেমে গেল গিলটি মিয়া। ওরা যে দরজা দিয়ে ঢুকেছিল তার উল্টো দিকের দরজাটা ফাঁক হয়ে গেছে। সেই ফাঁকে দেখা যাচ্ছে একটা পয়েন্ট ফোর ফাইভ কোল্ট অটোমেটিক। পিস্তলধারী এক পা এগিয়ে আসতেই চিনতে পারল সে সিলভিওকে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'এই সেরেচে! এ-লোক থাকে পাতায় পাতায়।'

'এক পা নড়লে মারা যাবে, মাসুদ রানা,' বলল সিলভিও চাপা গলায়। গিলটি মিয়াকে বলল, 'তুমিও বসে থাকো চুপচাপ!'

পাঁই করে ঘুরল রানা। লাফ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা

করল কলজেটা বুকের ভিতর থেকে, পারল না। ধুপধাপ ধুপধাপ হাতুড়ি পিটে চলেছে হৃৎপিণ্ড।

সিলভিওর পিছু পিছু ঘরে ঢুকল লুইসা পিয়েত্রো।

'এই যে রানা, কেমন আছ?' হাসল লুইসা। 'বিদায় না নিয়েই চুপি চুপি পালিয়ে যাচ্ছিলে যে?'

গোলাপী সিল্কের ব্লাউজ আর কালো একটা স্কার্টের উপর চমৎকার একখানা থ্রী-কোয়ার্টার মিংক কোট পরেছে লুইসা। স্বর্গের অপ্সরী মনে হচ্ছে ওকে দেখে। এগিয়ে এসে একটা সোফায় বসল লুইসা, রানার দিকে চেয়ে হাসল মিষ্টি করে।

'এই যে, কি খবর!' অনেক কষ্টে মুখের ভাব অপরিবর্তিত রেখে বলল রানা। জ্যাকেটের পকেটে রাখা লাল নোট বইটা স্পষ্ট ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। 'কিন্তু তোমাদের এবারের আবির্ভাবটা একটু অতিরিক্ত বিপজ্জনক হয়ে গেল না? দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন গার্ড, আরও দু'জন রয়েছে খুব কাছেই।'

'ও নিয়ে তোমার ভাবতে হবে না,' বলল সিলভিও। 'বাইরের গার্ড আমার লোক। নোট বইটা এবার দিয়ে দাও লক্ষ্মী ছেলের মত। ওটা পেলে তোমাদের যাত্রায় আর কোন বিঘ্ন ঘটাব না আমি। না দিলে মারা পড়বে এক মিনিটের মধ্যে।'

'আমাদের মেরে এয়ারপোর্ট থেকে পালাতে পারবে না তুমি, সিলভিও। খামোকা ভয় দেখিয়ো না। সারা এয়ারপোর্টে যত গার্ড আছে সব তোমার লোক, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না।'

'কথা বাড়িয়ো না, মাসুদ রানা। ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছেচি আমি। কেউ ঠেকাতে পারবে না আমাকে। দিয়ে দাও বইটা!'

আশ্চর্য রকম জ্বলজ্বল করছে সিলভিওর চোখ দুটো।

'প্লীজ, রানা!' কথা বলে উঠল লুইসা। ওর চোখে মিনতি আর উদ্বেগ। 'দিয়ে দাও ওটা। ও যা বলছে ঠিক তাই করবে। কি লাভ

অনর্থক প্রাণ দিয়ে? নোট বইটা দিয়ে দিলে সত্যিই ছেড়ে দেবে ও তোমাকে। কথা দিয়েছে ও।'

বেশ খানিকটা সামলে নিয়েছে রানা। মিষ্টি করে হাসল লুইসার দিকে চেয়ে।

'অপূর্ব সুন্দর লাগছে তোমাকে, লুইসা। মনে হচ্ছে তোমার অনুরোধ রক্ষা করে ফেলতাম যদি আমার পক্ষে সম্ভব হত। আসলে সত্যিই নোট বইটা আমার কাছে নেই।'

'কোন রকম ধোকাবাজি আর খাটবে না, মাসুদ রানা।' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল সিলভিও। 'দশ সেকেণ্ড সময় দেব তোমাকে, তারপর গুলি করব!'

ওর চোখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারল রানা, সত্যিই গুলি করবে সিলভিও।

'ওটা কনসালকে দিয়ে দিয়েছি আমি। এতক্ষণে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে পোরা হয়ে গেছে। নিরাপদে পৌঁছে যাবে ওটা কাল কলকাতায়।'

'মিথ্যে কথা!' গর্জে উঠল সিলভিও।

নিরুপায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। সহজ ভঙ্গিতে এসে বসল লুইসার পাশে।

'বিশ্বাস না করলে আমার কি করার আছে, বলো? সার্চ করে দেখতে পারো,' মৃদু হেসে বলল রানা।

'ঠিক আছে, তাই করছি।' রানার উপর থেকে চোখ না সরিয়ে এক-পা পিছিয়ে গেল সিলভিও, দরজাটা একপাট খুলে ডাকল, 'গীয়ান! ভেতরে এসো!'

লুইসার একটা হাত তুলে নিল রানা নিজের হাতে। হাত বুলাল নরম মিংক কোটের হাতায়।

'সুন্দর কোটটা। মিংক পরলে অসুন্দরীকেও সুন্দর লাগে দেখতে, আর সুন্দরীকে লাগে অপূর্ব। তোমাকে আমার কেমন

লাগছে বলতে পারবে?'

'সুন্দরী...' কথাটা বলেই টের পেল লুইসা এই ধরনের আলাপের উপযুক্ত সময় এটা নয়। রানার চোখে স্থির হলো ওর উদ্বিগ্ন দৃষ্টি। সরাসরি কাজের কথায় এল সে। 'সত্যিই নেই ওটা তোমার কাছে?'

'আল্লার কসম!' হাসল রানা। 'তোমার ভাই আমাকে এত বোকা মনে করে কেন? আমি তো জানতাম এয়ারপোর্টে শেষ চেষ্টা করবে ও বইটা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে। ওটা আমার কাছে রাখার চেয়ে কনসুলেটের ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে পাঠানো হাজার গুণ নিরাপদ।'

গীয়ান এসে ঢুকল ঘরে। কটমট করে চাইল রানার চোখের দিকে। রানা টের পেল নিশপিশ করছে ওর হাত, ছটফট করছে ভিতর ভিতর প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে।

'এই দু'জনকে সার্চ করো, গীয়ান!' বলল সিলভিও। 'কি খুঁজছি তা তো তোমার জানাই আছে। জলদি!'

মাথার উপর হাত তুলে উঠে দাঁড়াল রানা। গিলটি মিয়ার দিকে চেয়ে বলল, 'কোন গোলমাল কোরো না, গিলটি মিয়া। যা বলে, করো। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই এখন।'

সার্চ শুরু করল গীয়ান।

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রয়েছে গিলটি মিয়া।

রানার সারা শরীর সার্চ করে সরে দাঁড়াল গীয়ান। সিলভিওর দিকে ফিরল।

'নেই।'

'এবার ওই লোকটা,' বলল সিলভিও।

পিস্তলের ইঙ্গিতে মাথার উপর হাত তুলে দাঁড়াল গিলটি মিয়া। দক্ষ হাতে ওকেও সার্চ করল গীয়ান, তারপর সরে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ল। নেই।

'এবার সন্তুষ্ট হয়েছ?' বসে পড়ল রানা। 'পারলে না, সিলভিও। হেরে গেলে শেষ পর্যন্ত। ওটার কলকাতায় পৌঁছানো আর ঠেকানো গেল না। কালই রওনা হয়ে যাবে ওটা সশস্ত্র প্রহরায়।'

'ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগের কথাটা আমাকে না বললেই ভাল করতে মাসুদ রানা।' চতুর একটুকরো হাসি খেলে গেল সিলভিওর ঠোঁটে। 'দাঁড়াও, এখনই তার প্রমাণ দিচ্ছি।' গীয়ানকে ইঙ্গিত করতেই রিভলভার বের করে তাক করে ধরল সে রানার বুকের দিকে। কোণের টেবিলের উপর রাখা টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেল সিলভিও।

'ইণ্ডিয়ান কনসুলেট দিন দয়া করে,' বলল সিলভিও মাউথপিসে। পনেরো সেকেণ্ড চুপচাপ থেকে বলল, 'সুকান্ত পালিতকে দিন দয়া করে।' আবার খানিক চুপ। 'পালিত? এই কিছুক্ষণ আগে একটা জিনিস দিয়েছে মাসুদ রানা তোমাদের বসের হাতে।' তিন সেকেণ্ড বিরতি। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছ! নীল প্লাষ্টিক মোড়া। দেখেছ ওটা তুমি?' বিরতি। 'আমি জানি, কলকাতায় যাচ্ছে।' আবার বিরতি। 'কি বললে? তোমারই ওপর ভার পড়েছে? ভেরি গুড! শোনো। ওটা আমার দরকার। বুঝতে পেরেছ? আধঘণ্টার মধ্যে আমার হাতে পৌঁছে দিতে হবে ওটা।' কয়েক সেকেণ্ড বিরতি। হেসে উঠল সিলভিও। 'অবশ্যই। এ চাকরি তোমার আজই শেষ। কাল থেকে আর যেতে হবে না কনসুলেটে। ঠিক আছে, রাখলাম। আধঘণ্টা পর আমার ওখানে আসছ তুমি।' রিসিভার নামিয়ে বিজয়ীর ভঙ্গিতে ফিরল সিলভিও রানার দিকে। 'শেষ পর্যন্ত কে হারল, মাসুদ রানা? পালিতের হাতেই ভার দেয়া হয়েছে ওটা ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে ভরে কলকাতা পাঠাবার।' হাসল তৃপ্তির হাসি। 'কি লাভ হলো? এত ছোটাছুটি, এত দৌড়ঝাঁপ, এত লোকক্ষয়- কে জিতল শেষ পর্যন্ত?'

রেগে উঠে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল রানা, ওর ঠোঁটের ওপর একটা আঙুল রাখল লুইসা।

'প্লীজ, রানা! হারজিত তো সব কিছুতেই আছে। সব সময় জিতলে চলে না, মাঝে মাঝে হারতেও হয়। চেষ্টার তো তুমি কোন ত্রুটি করোনি। মেনে নাও। ও ভয়ানক চতুর আর হারামী লোক। তাছাড়া তুমি তো একা, আর ওর হয়ে কাজ করছে হাজারটা লোক। ভয়ঙ্কর সব লোক। তুমি পারবে কেন?'

হাসল সিলভিও। 'ঠিকই বলেছে লুইসা। মনের মধ্যে রাগ পুষে রাখবেন না, সিনর মাসুদ রানা। একটা ভয়ঙ্কর দুর্ধর্ষ সংস্থার সাথে একা লড়ে আপনি আপনার পাঞ্জার যে জোর দেখিয়েছেন, আমি আজীবন শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখব সে কথা। চলুন, আপনাকে প্লেনে তুলে দিই এবার।' অস্ত্র পকেটে পুরল সিলভিও, কিন্তু হাতটা রয়ে গেল পকেটেই। গীয়ানও তাই করল। 'চলুন। দয়া করে বিদায়ের আগে আর কোন রকম গোলমাল পাকাবার চেষ্টা করবেন না। খেয়াল রাখবেন দুটো পিস্তল আপনাদের দু'জনের হৃৎপিণ্ড লক্ষ্য করে প্রস্তুত আছে সর্বক্ষণ।'

'তুমি আসবে না আমাকে সী অফ করতে?' জিজ্ঞেস করল রানা লুইসাকে।

'নিশ্চয়ই!'

দ্রুত পায়ে এগোচ্ছে ওরা টারমাকের উপর দিয়ে প্লেনের উদ্দেশে। রানার কনুই জড়িয়ে ধরেছে লুইসার কনুই। আবার কবে কোথায় দেখা হবে সে ব্যাপারে নিচু গলায় কথা হচ্ছে ওদের মধ্যে।

ছুটে এল একজন সুন্দরী এয়ার হোস্টেস।

'আপনি সিনর মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি আমরা। উঠে পড়ুন।'

‘যাচ্ছি। উঠে পড়ো, গিলটি মিয়া, আমি আসছি এক্ষুণি।’

তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল গিলটি মিয়া, সিঁড়ির মাথায় গিয়ে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে চাইল রানার দিকে। গেল কোথায় নোট বইটা!

লুইসার দিকে ফিরল রানা। একটা হাত চলে গেল ওর ক্ষীণ কটিতে। কাছে সরে এল লুইসা। আলতো করে ছোট্ট একটা চুমো খেলো রানা ওর ঠোঁটে। বলল, ‘আবার দেখা হবে।’

চোখ দুটো টলটল করে উঠল লুইসার। বলল, ‘ভায়া খণ্ডিওস্, মাই ডার্লিং।’

সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে বার দুই হাত বুলাল রানা লুইসার বাহুতে, তারপর হঠাৎ ঘুরে তরতর করে উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে। শেষ ধাপে উঠে টা-টা করল সবাইকে। ঢুকে গেল ভিতরে।

বন্ধ হয়ে গেল দরজা। সিঁড়ি সরে চলে গেল।

গিলটি মিয়ার দিকে এগোতে গিয়েও থমকে গেল রানা। হাসিমুখে ডাকল ওকে অনিল। তরতাজা হয়ে উঠেছে বিশ্রাম পেয়ে।

‘পাশের সীটটা খালি আছে, রানা। বসে পড়ো।’

একসাথে গর্জে উঠল চারটে এঞ্জিন। রওনা হবে এখুনি। বসে পড়ল রানা।

‘ওরা জানে মারা গেছ তুমি,’ বলল রানা। ‘এসো যাবার আগে ওদের ভূত দেখানো চমকে দেয়া যাক।’

দু’জন চাইল জানালা দিয়ে বাইরে।

আর্ক লাইটের নিচে দাঁড়িয়ে আছে লুইসা, সিলভিও আর গীয়ান। হাত নাড়ল রানা।

রানার পাশের মুখটা দেখেই আঁৎকে উঠল ওরা তিনজন। হাঁ হয়ে গেছে ওদের মুখ, বিস্ফারিত তিন জোড়া চোখ। ধীরে ধীরে নড়তে শুরু করল প্লেনটা। শেষ চমক দিয়ে দিল রানা ওদের।

পকেট থেকে ছোট্ট একটা লাল নোটবই বেরিয়ে এল, সেটা নেড়ে টা-টা করল ওদের।

মুহূর্তে বুঝতে পারল ওরা, মস্ত ধোঁকা দিয়েছে রানা, কনসুলেটে জমা দেয়নি, নোটবইটা সাথে নিয়েই চলে যাচ্ছে সে। ঠেকাবার কোন রাস্তা নেই আর।

হতাশা, বিক্ষোভ, ক্রোধ, প্রতিহিংসা, এবং পরাজয়- সবগুলো ভাবের খেলা দেখতে পেল রানা সিলভিওর মুখে। নিজের অজান্তেই কয়েক পা দৌড়ে এল সিলভিও প্লেনের সাথে সাথে, তারপর দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল টারমাকের উপর।

রানওয়ের দিকে ছুটল প্লেনটা।

এগারো

ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল হলের উপর দিয়ে একটা পাক খেয়ে ঘুরে নামতে শুরু করল বি.ও.এ.সি। তিন মিনিটের মধ্যেই ল্যাণ্ড করবে দমদম এয়ারপোর্টে। কন্টিনেন্টাল হোটেলটা এক ঝলক দেখতে পেল রানা। মাত্র আটদিন! অবাক হয়ে ভাবল রানা, মনে হচ্ছে যেন কত যুগ পেরিয়ে গেছে। কিন্তু আসলে মাত্র আটদিন আগে রওনা হয়েছিল ও কলকাতা থেকে। কী বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে কেটেছে এই আটটা দিন, মনে হয় দিন তো নয়, যেন আট বছর কাটিয়ে এল সে ইউরোপে।

অথচ সব ঘটনা অনিলকে বলতে কত সময় লেগেছিল? পঁয়তাল্লিশ মিনিট!

‘কিন্তু তোমাকে প্লেনে ওঠার আগে যখন সার্চ করা হলো, তখন

বইটা পাওয়া গেল না কেন?' দমদমে নামার কয়েক মিনিট আগে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল অনিল।

এটা গিলটি মিয়ারও প্রশ্ন। ঠিক পিছনের সীটে বসেছে সে, সামনে ঝুঁকে এল উত্তরটা শোনার জন্যে।

হাসল রানা। 'সার্চ করবার ঠিক কয়েক সেকেণ্ড আগে লুইসার মিংক কোটের হাতার ভাঁজে ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম ওটা।'

'আচ্ছা!' চোখ কপালে উঠল অনিলের। 'সেই জন্যেই বিদায়মুহূর্তে অত প্রেম উথলে উঠেছিল তোমার? চুমু খাওয়ার ফাঁকে তুলে নিলে বুঝি ওটা আবার?'

'হ্যাঁ। এবার তোমার দিকটা শোনাও, অনিল। আমি কিন্তু সবটা ব্যাপার জানি না এখনও।'

'আমি তোমার মত গুছিয়ে বলতে পারি না,' বলল অনিল। 'তুমি প্রশ্ন করো, আমি উত্তর দিই।'

'বেশ আমি যেটুকু বুঝেছি, সেটা হচ্ছে সিলভিও পিয়েত্রোর গ্লাস ফ্যাক্টরির মাধ্যমে কোসা নোস্ট্রার ড্রাগ ট্রাফিক শুরু হয়েছিল ভারতে। খুব সম্ভব কাঁচের খেলনা, পুতুল বা ঘর সাজাবার কাঁচের সামগ্রীর মধ্যে করে আসত ওটা। এ ব্যাপারেই পাঠানো হয়েছিল তোমাকে ইটালীতে।'

'হ্যাঁ। দুই তরফা ট্রাফিক শুরু হয়েছিল। এখান থেকে যেত কাঁচামাল, ওখান থেকে আসত ফিনিশ্‌ড্‌ গুড হেরোইন হয়ে। কিন্তু আসলে যে ব্যাপারে আমার যাওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল সেটা হচ্ছে আমাদের দেশের কয়েকজন খুবই উঁচু মহলের লোক জড়িয়ে পড়েছিল এই ব্যবসার সঙ্গে। ড্রাগের সাথে এরা গোপন তথ্য ফাঁস করতে শুরু করেছিল। কোসা নোস্ট্রার এটাও একটা সাইড বিজনেস। ইনফরমেশন বিক্রি। আমাদের চীফ টের পেলেন যে এইসব হোমরা-চোমরা প্রভাবশালী লোকদের মধ্যে আমাদের ডিপার্টমেন্টেরও কেউ কেউ জড়িত আছেন। কিন্তু এতই

সাবধানে চলছিল কাজটা যে কাউকে ধরা তো দূরে থাকুক, সন্দেহ করবারও উপায় ছিল না। দিশে না পেয়ে গোপনে ডেকে নিয়ে আমার পরামর্শ চাইলেন রঞ্জন চৌধুরী।'

'তুমি প্ল্যান দিলে যে ডবল-এজেন্টের রোল করে তুমি নামগুলো বের করে আনবে।'

'হ্যাঁ। এই প্ল্যানের মস্ত দুর্বলতা ছিল একটাই। সেটা হচ্ছে, বিপদে পড়লে সাহায্য পাব না কারও কাছে। প্ল্যানটা বাস্তবায়নের জন্যে এই তরফকে অভিনয় করতে হবে যে আমি বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী। কাজেই সাহায্যের প্রশ্নই ওঠে না। একা কাজ করতে হবে আমাকে। ধরা পড়লে নির্ঘাত মৃত্যু। প্রথমটায় বারণ করেছিলেন আমাদের চীফ, কিন্তু আমার চাপাচাপিতে রাজি হয়ে গেলেন। ওঁর তখন খ্যাপা কুকুরের মত অবস্থা। রাজি না হয়ে উপায়ও ছিল না।'

'তারপর তুমি কাজ শুরু করলে। উনিও চুটিয়ে অভিনয় শুরু করলেন অতি অভিনয় হয়ে যাচ্ছে কিনা সে খেয়াল না করেই।'

'উপায় ছিল না ওঁর।' চীফের পক্ষ নিল অনিল। 'প্রথম চার মাসে ওদের মধ্যে ঢুকে পড়ার পথ তৈরি করলাম। ছোট্ট একটা কাজের ভার দিল, সেটা সুসম্পন্ন করলাম কলকাতায় এসে। তারপর ফিরে গিয়ে ওদের সাথে যোগ দিলাম পুরোপুরি ভাবে।' ম্লান হাসল অনিল। 'তার পরের সব ঘটনা তো তুমি জানোই।'

চুপচাপ বসে রইল ওরা কিছুক্ষণ।

নেমে পড়ল প্লেন।

কলকাতাতেও নোট বইটা উদ্ধারের চেষ্টা চালানো সিলভিওর পক্ষে অসম্ভব নয়। তাই লণ্ডন পৌঁছেই খবর দিয়েছিল রানা রঞ্জন চৌধুরীকে। এয়ারপোর্টে গার্ডের ব্যবস্থা করবার অনুরোধ জানিয়েছিল। অনিলকে সাথে নিয়ে ফিরছে, সে খবরও জানাতে ভুল করেনি।

প্লেনটা থেমে দাঁড়াতেই যাত্রীরা কে কার আগে নামবে তাই নিয়ে হুড়োহুড়ি শুরু করল। যেন প্রত্যেকেই দারুণ ব্যস্ত, জরুরী কাজ পড়ে আছে, এক্ষুণি না নামলে চলবে না। ওরা তিনজন বসে রইল গ্যাট হয়ে।

রানা ও গিলটি মিয়ার স্যুটকেস দুটোও তুলে দিয়েছিল বাতিস্তা অনিলের সাথে। ওগুলোর ভার গার্ডদের কাউকে দেবে বলে ঠিক করল রানা। এই খোলা এয়ারপোর্টে অনিলকে নিয়ে কাস্টমস ক্লিয়ারেনসের জন্যে অপেক্ষা করা ঠিক হবে না।

দরজা খুলে দেয়ার আধ মিনিটের মধ্যে হুড়মুড় করে নেমে গেল সব যাত্রী। রানা এসে দাঁড়াল দরজার সামনে। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পরীক্ষা করল বাইরেটা। আট-দশ জনের একটা দল এগিয়ে আসছে প্লেনের দিকে। অনিলের মাকে পরিষ্কার চিনতে পারল রানা। সাদা শাড়ি, চোখে চশমা, হাতে ছাতা আর ব্যাগ। একটু পিছিয়ে পড়েছেন উনি। তাঁর আগে হাঁটছেন ইণ্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের ডাকসেটে চীফ- রঞ্জন চৌধুরী। আশেপাশের সাদা পোশাক পরা লোকগুলোকেও দেখবার চোখ থাকলে চিনতে ভুল হয় না- সিক্রেট সার্ভিসের ট্রেনিং পাওয়া গার্ড।

নেমে এল ওরা প্লেন থেকে। অনিলের হাতে গুঁজে দেয়ার চেষ্টা করল রানা নোটবইটা, কিন্তু কিছুতেই নিল না সে।

'না, রানা। তুমি উদ্ধার করে এনেছ ওটা। তুমিই তুলে দাও ওঁর হাতে।'

'কি খবর? কেমন আছেন?' হাত বাড়িয়ে দিল রানা।

হ্যাণ্ডশেক করতে গিয়ে হাতে নোট বইটা ঠেকতেই একটু কুঁচকে উঠল রঞ্জন চৌধুরীর ভ্রূ জোড়া, মুহূর্তে সামলে নিয়ে হাসিমুখে জোরে ঝাঁকিয়ে দিলেন রানার হাত। হাতটা ছেড়ে দিয়ে রুমাল বের করলেন বেঢপ সাইজের কোটের পকেট থেকে। ততক্ষণে নোট বইটা চলে গেছে ওঁর পকেটে।

'দেখা যাচ্ছে, মাঝে মাঝে পরের ব্যাপারে নাক গলালে পরেরই উপকার হয়- কি বলেন, মিস্টার মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ,' মৃদু হেসে জবাব দিল রানা। 'আর লৌহমানব স্পাইদের মধ্যেও দু'এক টুকরো কোমল মনোবৃত্তি থাকা ততোটা পাপ নয়।'

'কথাটা আমি আর একটু ভেবে দেখব,' গম্ভীর হয়ে বললেন রঞ্জন চৌধুরী। 'সিদ্ধান্ত নেব আপনার কাছ থেকে পুরো ঘটনার রিপোর্ট পাওয়ার পর।'

'আমার যা বলার সব বলে দিয়েছি অনিলকে। ওর কাছেই রিপোর্ট নিয়ে নেবেন। সন্ধ্যার ফ্লাইটে ঢাকায় ফিরতে চাই আমি।'

অনিলকে জড়িয়ে ধরে মুহুর্মুহু চুমো খাচ্ছিলেন বৃদ্ধা। কথাটা কানে যেতেই খপ করে ধরলেন রানার হাত। আনন্দে, উত্তেজনায় কাঁপছে হাতটা।

'সেটি হচ্ছে না, বাবা!' কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন বৃদ্ধা। 'ক'দিন আমার কাছে থাকতে হবে তোমাকে। নিজ হাতে রান্না করে তোমাকে না খাওয়াতে পারলে মরেও শান্তি পাব না আমি, বাবা।'

'এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো ঠিক হচ্ছে না,' বললেন রঞ্জন চৌধুরী। হাত তুলে ইশারা করতেই তিনটে গাড়ি এগিয়ে এল এদিকে। রানার দিকে হাত বাড়ালেন তিনি। 'আপনাদের মালের আইডেন্টিফিকেশন ট্যাগ আর টিকেটগুলো দিন।' রানার হাত থেকে ওগুলো নিয়ে বললেন, 'খানিক বাদে এদের কেউ পৌঁছে দেবে ওগুলো অনিলের বাড়িতে। চলি। গুড বাই।'

দুটো গাড়িতে উঠে পড়লেন রঞ্জন চৌধুরী একজন ছাড়া বাকি দলবল নিয়ে। তৃতীয় গাড়িটার দিকে টানলেন বৃদ্ধা রানাকে। পালিয়ে যাবে মনে করে আঁকড়ে ধরে আছেন তিনি এখনও রানার হাত।

গিলটি মিয়া বসল ড্রাইভারের পাশের সীটে। ওকে ঠেলে প্রায় ড্রাইভারের গায়ে সাঁটিয়ে দিয়ে উঠে বসল গার্ড। পিছনের সীটে অনিল ও রানাকে দু'পাশে নিয়ে মাঝখানে বসলেন বৃদ্ধা। রওনা হলো গাড়ি।

তেমনি আঁকড়ে ধরে আছেন বৃদ্ধা রানার হাত। মুখে আশ্চর্য উজ্জ্বল এক টুকরো পবিত্র হাসি। নিঃশব্দে হাসছেন তিনি। হাসছেন, তো হাসছেন, তো হাসছেনই। হাসছে মায়ের প্রাণ।

সারাটা পথ হাসতে হাসতে চললেন বৃদ্ধা।

দুই চোখে জলের ধারা।

(শেষ)